বণিক বার্তা
24 AUG 2026

ইউরোপে রফতানিতে তৈরি পোশাকের পাশাপাশি অন্য খাতের অংশগ্রহণ বাড়াতে চাই

খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির
মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ইউরোপের বাজারে সম্ভাবনা বা সামগ্রিকভাবে **তৈরি** পোশাকের সম্ভাবনা এখনো অনেকখানি **বাকি**। বাকি বলছি এজন্য যে আমরা তো এখনো নিম্ন ও মধ্যম মূল্যের পণ্য তৈরি করি। উচ্চ মূল্যের পণ্য করি না। কৃত্রিম তন্তুতে এখনো আমরা যথেষ্টভাবে যাইনি। এভাবে তৈরি পোশাকের মধ্যেও অনেকগুলো বিভাগ, যেগুলো **মূল্য** সংযোজিত বিভাগ, ওগুলো নিয়ে আমরা **এখনো** ওই বাজারে প্রবেশ করতে পারিনি। তো **এদিকে আমাদের** অংশগ্রহণ (শেয়ার) যত বাড়বে, তত আমাদের ইউনিটপ্রতি পণ্যের দাম বাড়তে থাকবে। এখনো ইউরোপের বাজার, আমেরিকান বাজার—সব বাজারেই আমাদের এখনো যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রেও।

তৈরি পোশাকের বাইরে অনেকগুলো পণ্য আছে। লেদার ও নন-লেদার পণ্য আছে, চিংড়ি আছে, মাছ আছে। পাটের সুযোগ আছে। জাহাজ নির্মাণের সুযোগ আছে। এ সম্ভাবনাগুলো কাজে লাগানোর জন্য আমরা কাজ করছি এবং অল্পদিনের মধ্যেই দেখবেন, চামড়া নিয়ে আমরা একটা বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা পেশ করব, পাট নিয়ে কর্মসূচি পেশ করব। আমরা জাহাজ নির্মাণ নিয়ে কাজ করছি। আন্তঃমন্ত্রণালয় একটা কমিটি আছে জাহাজ নির্মাণের। এবং জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ, এ দুটি নিয়েও আগামী দিনে আমরা আমাদের কর্মসূচি পেশ করব। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, তৈরি পোশাকের এখনো যথেষ্ট সুপ্ত সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তৈরি পোশাকের আরো বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্য বিভাগের ওপর আমাদের অংশগ্রহণ (শেয়ার) বাড়ানো। সঙ্গে সঙ্গে অন্য খাতগুলোতে আমাদের রফতানি বাড়ানো। এটা হচ্ছে আমাদের আগামী দিনের লক্ষ্য।

ইউরোপ অশুল্ক বাধার একটা তালিকা দিয়েছিল আমাকে, আমার সঙ্গে যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন। সেটা নিয়ে আমরা যথেষ্ট কাজ করেছি। এবং সেই কাজের ওপর তাদেরকে আমরা একটা হালনাগাদ তথ্য দেব। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই আমরা একটা নতুন তারিখে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সব রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বসে আমরা একটা হালনাগাদ তথ্য দেব। এটা নিয়ে আমরা কাজ করেছি। ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) তো অনেকগুলো দেশ, ২৭টি দেশ। তাদের সঙ্গে এফটি আমরা চেষ্টা করব যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করার জন্য। দু-তিন বছর তো লাগবেই।

বণিক বার্তা
24 AUG 2026

ইইউতে ইবিএ সুবিধা হারানোর আগে জিএসপি প্লাস সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করতে হবে

ড. ফরিদুল আলম

বাংলাদেশের রফতানি আয়ের ৫০ ভাগের বেশি আসে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৭ দেশ থেকে। ২০২৫ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নই তাদের বাণিজ্য প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বাংলাদেশ তাদের ৩৫তম বড় বাণিজ্য সহযোগী। এ দুই পক্ষই বর্তমান অংশীদারত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি (পার্টনারশিপ অ্যান্ড কো-অপারেশন এগ্রিমেন্ট-পিসিএ) করার জন্য জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এলডিসি উত্তরণের আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে এ ধরনের চুক্তি গড়ে তোলার অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বহুমুখী। বর্তমানে অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র ও চীন বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়নের দিকে আমাদের মনোযোগ বেশি হওয়া জরুরি।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে রফতানি আয়ের প্রধান উৎস তৈরি পোশাক। সমস্যা হলো সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপে আমাদের দেশের তৈরি পোশাকের বাজার ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। বিগত দুই বছরে আগের বছরগুলোর তুলনায় এ খাতে রফতানি আয় অনেকটাই কমেছে। বিশেষ করে ১৫টি দেশ, যারা এতদিন ধরে বড় ক্রেতা ছিল, তাদের দিক থেকে চাহিদা আগের তুলনায় অনেকটা কমেছে। ইউরোস্ট্যাটের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে ৬০৯ কোটি ইউরোর তৈরি পোশাক রফতানি হয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৭৫৫ কোটি ইউরো। কিছু দেশে অবশ্য রফতানি বাড়লেও সেগুলোর বাজার বেশ ছোট, যা মোট রফতানি ঘাটতিকে পূরণ করে না। একক দেশ হিসেবে জার্মানি ছিল এই তৈরি পোশাকের বড় ক্রেতা। যুক্তরাষ্ট্রের পরই জার্মানি থেকে এ খাতে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ হতো। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জার্মানি থেকে রফতানি আয় ৪৯৫ কোটি ডলার থেকে কমে ৪৩৮ কোটি ডলারে নেমেছে। এটা দুশ্চিন্তার বিষয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়নে তৈরি পোশাক রফতানি কমার জন্য যে কারণগুলোকে দায়ী করা হচ্ছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অপরাপর উদীয়মান দেশের তুলনায় প্রতিযোগিতায় আমরা পিছিয়ে পড়ছি। তৈরি পোশাক রফতানির দিক থেকে চীন বরাবরই শীর্ষ অবস্থানে ছিল। তারা বাজারে নিজ অবস্থান ধরে রাখার পাশাপাশি রফতানি আয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। যদিও সার্বিক বিবেচনায় ইউরোপে আগের তুলনায় ক্রেতার সংখ্যা কমেছে, চীনসহ কয়েকটি দেশ প্রতিযোগিতায় নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ইউরোপের বাজার সংকুচিত হওয়ার কারণে ভারত কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তা বাংলাদেশের তুলনায় কম। এদিকে ভিয়েতনামও আগের অবস্থান ধরে রাখতে সফল।

২০২১ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে বের হয়ে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে পাঁচ বছরের একটি ট্রানজিশন (রূপান্তর) সময়কাল, অর্থাৎ ২০২৬ সাল পর্যন্ত এই সময়কে প্রস্তুতিমূলক সময় হিসেবে অনুমোদন করা হয়েছে। এ বছর এ সময়

উত্তীর্ণ হবে। ফলে বাংলাদেশ বহির্বিশ্বের যেসব দেশে অগ্রাধিকারমূলক শুল্কমুক্ত বাণিজ্যিক সুবিধা পেত, তা আর পাবে না। ইউরোপ অনেকটা মানবিক কারণে এ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আরো অতিরিক্ত তিন বছর সময় মঞ্জুর করেছে। এ সময়ের মধ্যে তাদের এভরিথিং বাট আর্মস (ইবিএ) কর্মসূচির আওতায় ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যিক সুবিধা পেতে থাকবে বাংলাদেশ। কিন্তু আধুনিক বিশ্ব বাণিজ্যের হিসেবে এটা শুধু প্রস্তুতিকাল।

নিঃসন্দেহে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ যেকোনো দেশের জন্য একটি স্বস্তিদায়ক প্রাপ্তি। এর মধ্য দিয়ে একটি দেশের আন্তর্জাতিক পরিসরে বিশেষ সুবিধা ছাড়া নিজেদের পণ্যের মানোন্নয়নের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেয়া ছাড়াও বাণিজ্য ও বিনিয়োগে অপরাপর দেশগুলোর একধরনের আস্থার প্রতিফলন ঘটে। এ বিবেচনায় কিছু চ্যালেঞ্জ থাকলেও বাংলাদেশের আগামীর অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে এবং উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে অর্থনীতিকে একই সূত্রে গাথার এটি একটি বড় সুযোগ বটে। দেশের ভেতর আরো বড় অর্থনৈতিক বিনিয়োগে এবং বেশি অংকের বিনিয়োগ প্রাপ্তির একধরনের নিশ্চয়তাও এর মধ্যে। তবে এ মুহূর্তে বাংলাদেশের এ প্রাপ্তি যেন আমাদের জন্য কিছুটা সমস্যা সৃষ্টি করে ফেলেছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে গত দুই বছরে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে অনেক অর্থ অবৈধ পথে দেশের বাইরে চলে গেছে। ফলে ব্যাংকগুলোতে সৃষ্টি হয়েছে তারল্য সংকট, সেই সঙ্গে বিদ্যমান অনেক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ব্যাপক আকারে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ কমে গেছে। এসব কিছু ইউরোপসহ বহির্বিশ্বে আমাদের বাণিজ্যে প্রভাব সৃষ্টি করে থাকতে পারে।

একই সঙ্গে এও বলা সংগত হবে যে বিশ্ব অর্থনীতি আগের অবস্থায় নেই। কয়েক বছর ধরে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের ঘনীভূত সংকট আরো ঘনীভূত হয়েছে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। ফলে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিই এক বড় ধরনের ধাক্কার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। চীন ও ভারতের মতো দেশের রয়েছে বিশাল বাজার, যার মধ্য দিয়ে তারা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে যতটা দরকষাকষির সামর্থ্য রাখে, সেই সুযোগটা আমাদের জন্য সীমিত। তবে একই সঙ্গে আমাদের জন্য এটাও সত্য যে তৈরি পোশাক শিল্পে বর্তমানে যে সংকট চলছে এটিতে বিশেষ নজর দেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। ভিয়েতনামের মতো দেশ, যারা পোশাক রফতানির দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে পিছিয়ে ছিল, এ খাতে নিজেদের সামর্থ্য ধরে রাখার পাশাপাশি তাদের সরকারও বিষয়টি নিয়ে বিশেষ যত্নশীল। সেই সঙ্গে কম্বোডিয়ার পোশাক খাতের কমপ্লায়েন্সের বিষয়টি বিবেচনা করলে, তারা এই দিক দিয়ে যথেষ্ট সন্তোষজনক অবস্থানে রয়েছে। আমাদের কমপ্লায়েন্সের পাশাপাশি এক্ষেত্রে ত্রিপক্ষীয় (ক্রেতা-সরকার ও শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে) একটি শক্তিশালী যোগাযোগের ভিত্তি তৈরি করতে হবে। সরকারের দিক থেকে অর্থনীতির স্বার্থে ব্যবসায়ীদের রাজনৈতিক বিবেচনার ঊর্ধ্বে রাখাটাও বিবেচনায় নিতে হবে, কেননা দিনশেষে এর মধ্য দিয়ে কর্মহীন হচ্ছে শ্রমিক এবং দেশ হারাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ রফতানি আয়।

পরিস্থিতির উন্নয়ন না ঘটলে বর্তমানে ইউরোপ থেকে ক্রমাবনতিশীল রফতানি আয়ের সঙ্গে ২০২৯ সালের পর বাংলাদেশ ইউরোপের বাজার থেকে ইবিএ সুবিধা হারালে অর্থনীতি আরো জটিল আকার ধারণ করবে। এ ধারা চলতে থাকলে ধারণা করা যায়, প্রতি বছর বাংলাদেশ আরো ৮০০ কোটি ডলার রফতানি আয় হারাবে, যা ভয়ংকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। পরিস্থিতির উত্তরণে এবং বাড়তি সুবিধা অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশের একমাত্র উপায় হচ্ছে ইউরোপে জিএসপি (জেনারাইলজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্সেস) প্লাস সুবিধার জন্য আবেদন করা। এটি রফতানি আয়কে সুরক্ষা দিলেও এর প্রাপ্তি নির্ভর করছে দেশের ভেতর শ্রম অধিকার, পরিবেশ সুরক্ষা, সুশাসন ও মানবাধিকারসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ২৭টি মূল কনভেনশন অনুসমর্থন এবং এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। সুতরাং এক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি সরকারের দিক থেকে আইনি বিধিবাধান এবং সুরক্ষাগুলো নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে হবে।

আমাদের একটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো মাত্র একটি খাতের ওপর নির্ভর করে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়তে চাচ্ছি। এমনটা মোটেও ঠিক নয়। ইউরোপের দেশগুলোতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বাইরে এতদিন ধরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতো হিমায়িত চিংড়ি। বর্তমানে তৈরি পোশাকের ক্রেতা কমে যাওয়ার ফলে আমাদের অন্যান্য রফতানি পণ্যের সক্ষমতাগুলো আরো বাড়িয়ে সেগুলোর গন্তব্যকে ইউরোপ ও এর বাইরের দেশগুলোতে পাঠানোর বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া জরুরি। ইইউভুক্ত যেসব দেশে আমাদের তৈরি পোশাকের চাহিদা

এরপর » পৃষ্ঠা ৪

আগে থেকেই কম ছিল, সেখানে কিন্তু আমাদের ফার্মাসিউটিক্যালসগুলো কর্তৃক তৈরি ওষুধের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে বলা জানা যায়। এ সম্ভাবনাময় খাতটিকে সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দিলে আমাদের জন্য ভালো ফল আসতে পারে। তাছাড়া চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রফতানি করে অনেক বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। বাংলাদেশে যে পরিমাণ চামড়া প্রক্রিয়ার অভাবে প্রতি বছর নষ্ট হয়, তা বেশ উদ্বেগজনক। এ শিল্পের মানোন্নয়নে

যে সময় যেমন পরিবর্তনশীল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদা, রুচি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা রাখে। এসব বিবেচনায় কেবল দুএকটি খাতের ওপর নির্ভরতা থেকে বের হয়ে আমাদের সম্ভাবনাময় অপরাপর খাতকে পরিচর্যা করে সেগুলোকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সক্ষম করে আমাদের এলডিসি থেকে উত্তরণ পরবর্তী বিকল্প হিসেবে দাঁড় করানো দরকার। একবার আমরা যখন পুরোপুরি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে

বাংলাদেশের রফতানি আয়ের ৫০ ভাগের বেশি আসে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৭ দেশ থেকে। ২০২৫ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নই তাদের বাণিজ্য প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বাংলাদেশ তাদের ৩৫তম বড় বাণিজ্য সহযোগী। এ দুই পক্ষই বর্তমান অংশীদারত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি (পার্টনারশিপ অ্যান্ড কো-অপারেশন এগ্রিমেন্ট-পিসিএ) করার জন্য জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এলডিসি উত্তরণের আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে এ ধরনের চুক্তি গড়ে তোলার অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বহুমুখী। বর্তমানে অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র ও চীন বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়নের দিকে আমাদের মনোযোগ বেশি হওয়া জরুরি।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে রফতানি আয়ের প্রধান উৎস তৈরি পোশাক। সমস্যা হলো সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপে আমাদের দেশের তৈরি পোশাকের বাজার ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। বিগত দুই বছরে আগের বছরগুলোর তুলনায় এ খাতে রফতানি আয় অনেকটাই কমেছে। বিশেষ করে ১৫টি দেশ, যারা এতদিন ধরে বড় ক্রেতা ছিল, তাদের দিক থেকে চাহিদা আগের তুলনায় অনেকটা কমেছে। ইউরোস্ট্যাটের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে ৬০৯ কোটি ইউরোর তৈরি পোশাক রফতানি হয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৭৫৫ কোটি ইউরো। কিছু দেশে অবশ্য রফতানি বাড়লেও সেগুলোর বাজার বেশ ছোট, যা মোট রফতানি ঘাটতিকে পূরণ করে না। একক দেশ হিসেবে জার্মানি ছিল এই তৈরি পোশাকের বড় ক্রেতা। যুক্তরাষ্ট্রের পরই জার্মানি থেকে এ খাতে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ হতো। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জার্মানি থেকে রফতানি আয় ৪৯৫ কোটি ডলার থেকে কমে ৪৩৮ কোটি ডলারে নেমেছে। এটা দুশ্চিন্তার বিষয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়নে তৈরি পোশাক রফতানি কমার জন্য যে কারণগুলোকে দায়ী করা হচ্ছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অপরাপর উদীয়মান দেশের তুলনায় প্রতিযোগিতায় আমরা পিছিয়ে পড়ছি। তৈরি পোশাক রফতানির দিক থেকে চীন বরাবরই শীর্ষ অবস্থানে ছিল। তারা বাজারে নিজ অবস্থান ধরে রাখার পাশাপাশি রফতানি আয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। যদিও সার্বিক বিবেচনায় ইউরোপে আগের তুলনায় ক্রেতার সংখ্যা কমেছে, চীনসহ কয়েকটি দেশ প্রতিযোগিতায় নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ইউরোপের বাজার সংকুচিত হওয়ার কারণে ভারত কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তা বাংলাদেশের তুলনায় কম। এদিকে ভিয়েতনামও আগের অবস্থান ধরে রাখতে সফল।

২০২১ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে বের হয়ে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে পাঁচ বছরের একটি ট্রানজিশন (রূপান্তর) সময়কাল, অর্থাৎ ২০২৬ সাল পর্যন্ত এই সময়কে প্রস্তুতিমূলক সময় হিসেবে অনুমোদন করা হয়েছে। এ বছর এ সময় উত্তীর্ণ হবে। ফলে বাংলাদেশ বহির্বিশ্বের যেসব দেশে অগ্রাধিকারমূলক শুল্কমুক্ত বাণিজ্যিক সুবিধা পেত, তা আর পাবে না। ইউরোপ অনেকটা মানবিক কারণে এ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আরো অতিরিক্ত তিন বছর সময় মঞ্জুর করেছে। এ সময়ের মধ্যে তাদের এভরিথিং বাট আর্মস (ইবিএ) কর্মসূচির আওতায় ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যিক সুবিধা পেতে থাকবে বাংলাদেশ। কিন্তু আধুনিক বিশ্ব বাণিজ্যের হিসেবে এটা শুধু প্রস্তুতিকাল।

নিঃসন্দেহে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ যেকোনো দেশের জন্য একটি স্বস্তিদায়ক প্রাপ্তি। এর মধ্য দিয়ে একটি দেশের আন্তর্জাতিক পরিসরে বিশেষ সুবিধা ছাড়া নিজেদের পণ্যের মানোন্নয়নের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেয়া ছাড়াও বাণিজ্য ও বিনিয়োগে অপরাপর দেশগুলোর একধরনের আস্থার প্রতিফলন ঘটে। এ বিবেচনায় কিছু চ্যালেঞ্জ থাকলেও বাংলাদেশের আগামীর অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে এবং উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে অর্থনীতিকে একই সূত্রে গাথার এটি একটি বড় সুযোগ বটে। দেশের ভেতর আরো বড় অর্থনৈতিক বিনিয়োগে এবং বেশি অংকের বিনিয়োগ প্রাপ্তির একধরনের নিশ্চয়তাও এর মধ্যে। তবে এ মুহূর্তে এ প্রাপ্তি যেন আমাদের জন্য কিছুটা সমস্যা সৃষ্টি করে ফেলেছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে গত দুই বছরে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে অনেক অর্থ অবৈধ পথে দেশের বাইরে চলে গেছে। ফলে ব্যাংকগুলোতে সৃষ্টি হয়েছে তারল্য সংকট, সেই সঙ্গে বিদ্যমান অনেক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ব্যাপক আকারে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ কমে গেছে। এসব কিছু ইউরোপসহ বহির্বিশ্বে আমাদের বাণিজ্যে প্রভাব সৃষ্টি করে থাকতে পারে।

একই সঙ্গে এও বলা সংগত হবে যে বিশ্ব অর্থনীতি আগের অবস্থায় নেই। কয়েক বছর ধরে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের ঘনীভূত সংকট আরো ঘনীভূত হয়েছে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। ফলে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিই এক বড় ধরনের ধাক্কার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। চীন ও ভারতের মতো দেশের রয়েছে বিশাল বাজার, যার মধ্য দিয়ে তারা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে যতটা দরকষাকষির সামর্থ্য রাখে, সেই সুযোগটা আমাদের জন্য সীমিত। তবে একই সঙ্গে আমাদের জন্য এটাও সত্য যে তৈরি পোশাক শিল্পে বর্তমানে যে সংকট চলছে এটিতে বিশেষ নজর দেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। ভিয়েতনামের মতো দেশ, যারা পোশাক রফতানির দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে পিছিয়ে ছিল, এ খাতে নিজেদের সামর্থ্য ধরে রাখার পাশাপাশি তাদের সরকারও বিষয়টি নিয়ে বিশেষ যত্নশীল। সেই সঙ্গে কম্বোডিয়ার পোশাক খাতের কমপ্লায়েন্সের বিষয়টি বিবেচনা করলে, তারা এই দিক দিয়ে যথেষ্ট সন্তোষজনক অবস্থানে রয়েছে। আমাদের কমপ্লায়েন্সের পাশাপাশি এক্ষেত্রে ত্রিপক্ষীয় (ক্রেতা-সরকার ও শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে) একটি শক্তিশালী যোগাযোগের ভিত্তি তৈরি করতে হবে। সরকারের দিক থেকে অর্থনীতির স্বার্থে ব্যবসায়ীদের রাজনৈতিক বিবেচনার ঊর্ধ্বে রাখাটাও বিবেচনায় নিতে হবে, কেননা দিনশেষে এর মধ্য দিয়ে কর্মহীন হচ্ছে শ্রমিক এবং দেশ হারাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ রফতানি আয়।

পরিস্থিতির উন্নয়ন না ঘটলে বর্তমানে ইউরোপ থেকে ক্রমাবনতিশীল রফতানি আয়ের সঙ্গে ২০২৯ সালের পর বাংলাদেশ ইউরোপের বাজার থেকে ইবিএ সুবিধা হারালে অর্থনীতি আরো জটিল আকার ধারণ করবে। এ ধারা চলতে থাকলে ধারণা করা যায়, প্রতি বছর বাংলাদেশ আরো ৮০০ কোটি ডলার রফতানি আয় হারাবে, যা ভয়ংকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। পরিস্থিতির উত্তরণে এবং বাড়তি সুবিধা অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশের একমাত্র উপায় হচ্ছে ইউরোপে জিএসপি (জেনারাইলজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্সেস) প্লাস সুবিধার জন্য আবেদন করা। এটি রফতানি আয়কে সুরক্ষা দিলেও এর প্রাপ্তি নির্ভর করছে দেশের ভেতর শ্রম অধিকার, পরিবেশ সুরক্ষা, সুশাসন ও মানবাধিকারসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ২৭টি মূল কনভেনশন অনুসমর্থন এবং এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। সুতরাং এক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি সরকারের দিক থেকে আইনি বিধিবিধান এবং সুরক্ষাগুলো নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে হবে।

আমাদের একটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো মাত্র একটি খাতের ওপর নির্ভর করে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়তে চাচ্ছি। এমনটা মোটেও ঠিক নয়। ইউরোপের দেশগুলোতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বাইরে এতদিন ধরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতো হিমায়িত চিংড়ি। বর্তমানে তৈরি পোশাকের ক্রেতা কমে যাওয়ার ফলে আমাদের অন্যান্য রফতানি পণ্যের সক্ষমতাগুলো আরো বাড়িয়ে সেগুলোর গন্তব্যকে ইউরোপ ও এর বাইরের দেশগুলোতে পাঠানোর বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া জরুরি। ইইউভুক্ত যেসব দেশে আমাদের তৈরি পোশাকের চাহিদা

এরপর » পৃষ্ঠা ৪

আগে থেকেই কম ছিল, সেখানে কিন্তু আমাদের ফার্মাসিউটিক্যালসগুলো কর্তৃক তৈরি ওষুধের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে বলা জানা যায়। এ সম্ভাবনাময় খাতটিকে সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দিলে আমাদের জন্য ভালো ফল আসতে পারে। তাছাড়া চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রফতানি করে অনেক বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। বাংলাদেশে যে পরিমাণ চামড়া প্রক্রিয়ার অভাবে প্রতি বছর নষ্ট হয়, তা বেশ উদ্বেগজনক। এ শিল্পের মানোন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের অনেক উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য সীমিত পরিসরে হলেও রফতানির চেষ্টা করা যায়। সেই সঙ্গে আমাদের মৌসুমি ফল, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আম এবং কাঁঠাল, এগুলো রফতানিতে সরকারের বিশেষ মনোযোগী হওয়া দরকার। আমাদের বাজারে অনেক বিদেশী ফল বিক্রি হলেও গুণে-মানে আমাদের অনেক দেশীয় ফল বৈদেশিক বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা রাখে। এই খাতটি থেকে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

গত শতাব্দীর শেষদিকে তৈরি পোশাক খাতটি একপর্যায়ে আমাদের অর্থনীতির প্রধান প্রাণসঞ্চারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। আমাদের মনে রাখা দরকার যে সময় যেমন পরিবর্তনশীল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদা, রুচি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা রাখে। এসব বিবেচনায় কেবল দুএকটি খাতের ওপর নির্ভরতা থেকে বের হয়ে আমাদের সম্ভাবনাময় অপরাপর খাতকে পরিচর্যা করে সেগুলোকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সক্ষম করে আমাদের এলডিসি থেকে উত্তরণ পরবর্তী বিকল্প হিসেবে দাঁড় করানো দরকার। একবার আমরা যখন পুরোপুরি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে সব আন্তর্জাতিক বাজার থেকে শুল্কমুক্ত সুবিধা হারাতে থাকব, আমাদের মনে রাখতে হবে যে পেছনে ফিরে যাওয়ার আর পথ অবশিষ্ট থাকবে না। বর্তমানে একক দেশ হিসেবে মার্কিন বাজারে এখনো আমাদের পণ্য রফতানি সবচেয়ে বেশি হচ্ছে কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক আরোপিত শুল্কের গ্যাঁড়াকলে আমরা কতদিন নিজেদের মানিয়ে নিতে পারব, সেটা একটা বড় প্রশ্ন। সুতরাং অন্যত্র নতুন বাজার খুঁজে বের করা যেমন জরুরি, ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গেও আমাদের বাণিজ্যের আরো বিকল্প খাত অন্বেষণ করা সমান গুরুত্বপূর্ণ।

লেখক: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বণিক বার্তা
24 AUG 2026

ইউরোপের বাজারে চিংড়ির হারানো দখল ফেরানোর বড় সুযোগ

সৈয়দ ইসতিয়াক

বাংলাদেশ থেকে ইউরোপের বাজারে চিংড়ি রফতানির ইতিহাস শুরু হয় ১৯৭০-এর দশক থেকে। এরপর ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে এবং ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কড়া নিয়মকানুন বা রেগুলেশনের অধীনে রফতানি প্রক্রিয়া আরো কাঠামোগত রূপ নেয়।

২০০০ সালের পর থেকে এ রফতানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বিশেষ করে ২০০৬ থেকে ২০০৮ সাল ছিল এ খাতের জন্য অত্যন্ত সুবর্ণ সময়। পরবর্তী সময়ে ২০০৯, ২০১০ ও ২০১১ সালে বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ চিংড়ি রফতানি হয়।

২০০৯-১১ অর্থবছর: বার্ষিক প্রায় ৩২ হাজার ৩৬৬ টন (যার মূল্য ১৭৩ মিলিয়ন ডলার) থেকে ৩৫ হাজার টন চিংড়ি ইউরোপে রফতানি হয়।

২০১২-১৫ সময়কাল: এ সময়ে রফতানির পরিমাণ ৩৫-৩৬ হাজার টনে বজায় ছিল।

২০১৮ সাল: এ বছরে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ৩৫৭ মিলিয়ন ডলার মূল্যের চিংড়ি ইউরোপে রফতানি করে, যা ছিল মোট চিংড়ি রফতানির প্রায় ৮০ শতাংশ।

বর্তমান বাজারের চিত্র ও ইউরোপের গুরুত্ব

বাংলাদেশের চিংড়ি রফতানির ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ যত চিংড়ি রফতানি করে, তার ৬০-৭৯ শতাংশই যায় ইউরোপের বাজারে।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে রফতানি অনেক হ্রাস পেয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ইউরোপে সামগ্রিক চিংড়ির চাহিদা অত্যন্ত বেশি থাকা সত্ত্বেও যেখানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন গত বছর প্রায় ৩ লাখ ২৯ হাজার ১৪৬ টন হিমায়িত চিংড়ি এবং ১ লাখ ৩৫ হাজার ৪৩৩ টন অন্যান্য চিংড়ি আমদানি করেছে, সেখানে বাংলাদেশের রফতানির পরিমাণ ব্যাপকভাবে কমে গেছে।

২০২৪-২৫ সালে যেখানে মোট রফতানি ছিল প্রায়

২৮ হাজার টন, সেখানে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ ইউরোপে মাত্র ১৪ হাজার ১০১ টন হিমায়িত চিংড়ি রফতানি করতে পেরেছে।

বর্তমান সংকটের প্রধান কারণ ও চ্যালেঞ্জগুলো

ইউরোপের বাজারে আমাদের চিংড়ি রফতানি কমে যাওয়ার পেছনে আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতি, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থার দুর্বলতা দায়ী।

বৈশ্বিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ

মন্দা ও মূল্য হ্রাস: ইউক্রেন যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার কারণে ইউরোপে চিংড়ির বাজারমূল্য কমে গেছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়: ইউরোপে তীব্র খরা ও দাবদাহের কারণে স্থানীয় কনজামশন বা চিংড়ি ক্রয়ের আগ্রহ হ্রাস পেয়েছে।

ভেনামি চিংড়ির আধিপত্য: কম দামের কারণে ইউরোপের ক্রেতারা আমাদের দামি ব্ল্যাক টাইগার (বাগদা) ছেড়ে সস্তা 'ভেনামি' (Litopenaeus vannamei) চিংড়ির দিকে ঝুঁকছেন।

তীব্র আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা: আমেরিকা ভারতের ওপর বাণিজ্যিক শুল্ক আরোপ করায় ভারত তাদের বিশাল বাগদা চিংড়ি উৎপাদন ইউরোপের বাজারে রূপান্তর করেছে। এছাড়া ভিয়েতনাম ও ভারতের প্রচুর উৎপাদনের কারণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে।

অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও কাঠামোগত সমস্যা

সনাতন চাষ পদ্ধতি: বাংলাদেশে এখনো ৯৯ শতাংশ চিংড়ি চাষ প্রাচীন বা সনাতন পদ্ধতিতে করা হয়। ঘেরগুলোর গভীরতা মাত্র এক-দেড় ফুট হওয়ায় অতিরিক্ত গরমে সহজেই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে।

হোয়াইট স্পট ভাইরাসের আক্রমণ: 'হোয়াইট স্পট সিনড্রোম ভাইরাস'-এর কারণে ঘেরে চিংড়ির ব্যাপক মড়ক দেখা দেয়।

পোনা পরিবহনে ত্রুটি: কক্সবাজার থেকে সাতক্ষীরা ও খুলনা অঞ্চলে বাগদা চিংড়ির পোনা একসময় বিমানে আসত, যা এখন ট্রাকে ১০-১২ ঘণ্টা পরিবহনের কারণে প্রচণ্ড ধকল বা স্ট্রেসের মুখে পড়ে, ফলে ঘেরে ছাড়ার পর এগুলো দ্রুত রোগে আক্রান্ত হয়।

নিম্ন উৎপাদনশীলতা: অপর্যাপ্ত খাবার ও চাষীদের আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে বাংলাদেশে হেক্টরপ্রতি চিংড়ির উৎপাদন মাত্র ৫০০ কেজি, অথচ প্রতিবেশী দেশগুলোতে আধা-নিবিড় (সেমি-ইনটেনসিভ) পদ্ধতিতে হেক্টরপ্রতি উৎপাদন প্রায় ১২-১৩ হাজার কেজি।

চাষী পর্যায়ে সুযোগ-সুবিধার অভাব: প্রান্তিক চাষীরা বিদ্যুৎ সুবিধা, ব্যাংক ঋণ, মানসম্মত পোনা, সুলভ মূল্যে খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা পান না।

অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি: দেশে চিংড়ি মাছের

এরপর » পৃষ্ঠা ৪

স্থানীয় চাহিদা ও ভোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় চাষী পর্যায়ে মাছের দাম বেড়েছে, যা আন্তর্জাতিক রফতানি মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে না।

সম্ভাবনা ও উত্তরণের উপায়

চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে, যা সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজে

ইউরোপের বাজারে আমাদের চিংড়ি প্রচারের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট ডেস্ক বা স্থায়ী উইং নেই। শেনজেন জোনের সুবিধা নিয়ে ইউরোপের একটি কেন্দ্রবিন্দুতে যদি প্রচার ও ব্র্যান্ডিং ক্যাম্পেইন চালানো যায়, তবে রফতানি অনেক বাড়ানো সম্ভব।

পণ্য বহুমুখীকরণ ও সার্টিফিকেশন

ইউরোপের ক্রেতারা বর্তমানে বহুবিধ ও

(যেমনটি চীন বা ইন্দোনেশিয়া করে) গ্রহণ করা যেতে পারে।

সরকারি নীতি সহায়তা ও খরচ হ্রাস

শিপমেন্ট ও ট্রান্সপোর্টেশন খরচ অনেক বেশি। সরকার যদি রফতানিকারক ও প্রসেসরদের নীতি সহায়তা দেয় এবং চুক্তিভিত্তিক চাষের মাধ্যমে কাঁচামাল উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে, তবে দেশের চিংড়ি রফতানি ১ বিলিয়ন ডলারের

ইউরোপের বাজারে চিংড়ির হারানো দখল ফেরানোর বড় সুযোগ

সৈয়দ ইসতিয়াক

বাংলাদেশ থেকে ইউরোপের বাজারে চিংড়ি রফতানির ইতিহাস শুরু হয় ১৯৭০-এর দশক থেকে। এরপর ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে এবং ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কড়া নিয়মকানুন বা রেগুলেশনের অধীনে রফতানি প্রক্রিয়া আরো কাঠামোগত রূপ নেয়।

২০০০ সালের পর থেকে এ রফতানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বিশেষ করে ২০০৬ থেকে ২০০৮ সাল ছিল এ খাতের জন্য অত্যন্ত সুবর্ণ সময়। পরবর্তী সময়ে ২০০৯, ২০১০ ও ২০১১ সালে বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ চিংড়ি রফতানি হয়।

২০০৯-১১ অর্থবছর: বার্ষিক প্রায় ৩২ হাজার ৩৬৬ টন (যার মূল্য ১৭৩ মিলিয়ন ডলার) থেকে ৩৫ হাজার টন চিংড়ি ইউরোপে রফতানি হয়।

২০১২-১৫ সময়কাল: এ সময়ে রফতানির পরিমাণ ৩৫-৩৬ হাজার টনে বজায় ছিল।

২০১৮ সাল: এ বছরে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ৩৫৭ মিলিয়ন ডলার মূল্যের চিংড়ি ইউরোপে রফতানি করে, যা ছিল মোট চিংড়ি রফতানির প্রায় ৮০ শতাংশ।

বর্তমান বাজারের চিত্র ও ইউরোপের গুরুত্ব

বাংলাদেশের চিংড়ি রফতানির ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ যত চিংড়ি রফতানি করে, তার ৬০-৭৯ শতাংশই যায় ইউরোপের বাজারে।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে রফতানি অনেক হ্রাস পেয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ইউরোপে সামগ্রিক চিংড়ির চাহিদা অত্যন্ত বেশি থাকা সত্ত্বেও যেখানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন গত বছর প্রায় ৩ লাখ ২৯ হাজার ১৪৬ টন হিমায়িত চিংড়ি এবং ১ লাখ ৩৫ হাজার ৪৩৩ টন অন্যান্য চিংড়ি আমদানি করেছে, সেখানে বাংলাদেশের রফতানির পরিমাণ ব্যাপকভাবে কমে গেছে।

২০২৪-২৫ সালে যেখানে মোট রফতানি ছিল প্রায়

২৮ হাজার টন, সেখানে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ ইউরোপে মাত্র ১৪ হাজার ১০১ টন হিমায়িত চিংড়ি রফতানি করতে পেরেছে।

বর্তমান সংকটের প্রধান কারণ ও চ্যালেঞ্জগুলো

ইউরোপের বাজারে আমাদের চিংড়ি রফতানি কমে যাওয়ার পেছনে আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতি, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থার দুর্বলতা দায়ী।

বৈশ্বিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ

মন্দা ও মূল্য হ্রাস: ইউক্রেন যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার কারণে ইউরোপে চিংড়ির বাজারমূল্য কমে গেছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়: ইউরোপে তীব্র খরা ও দাবদাহের কারণে স্থানীয় কনজামশন বা চিংড়ি ক্রয়ের আগ্রহ হ্রাস পেয়েছে।

ভেনামি চিংড়ির আধিপত্য: কম দামের কারণে ইউরোপের ক্রেতারা আমাদের দামি ব্ল্যাক টাইগার (বাগদা) ছেড়ে সস্তা 'ভেনামি' (Litopenaeus vannamei) চিংড়ির দিকে ঝুঁকছেন।

তীব্র আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা: আমেরিকা ভারতের ওপর বাণিজ্যিক শুল্ক আরোপ করায় ভারত তাদের বিশাল বাগদা চিংড়ি উৎপাদন ইউরোপের বাজারে রূপান্তর করেছে। এছাড়া ভিয়েতনাম ও ভারতের প্রচুর উৎপাদনের কারণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে।

অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও কাঠামোগত সমস্যা

সনাতন চাষ পদ্ধতি: বাংলাদেশে এখনো ৯৯ শতাংশ চিংড়ি চাষ প্রাচীন বা সনাতন পদ্ধতিতে করা হয়। ঘেরগুলোর গভীরতা মাত্র এক-দেড় ফুট হওয়ায় অতিরিক্ত গরমে সহজেই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে।

হোয়াইট স্পট ভাইরাসের আক্রমণ: 'হোয়াইট স্পট সিনড্রোম ভাইরাস'-এর কারণে ঘেরে চিংড়ির ব্যাপক মড়ক দেখা দেয়।

পোনা পরিবহনে ত্রুটি: কক্সবাজার থেকে সাতক্ষীরা ও খুলনা অঞ্চলে বাগদা চিংড়ির পোনা একসময় বিমানে আসত, যা এখন ট্রাকে ১০-১২ ঘণ্টা পরিবহনের কারণে প্রচণ্ড ধকল বা স্ট্রেসের মুখে পড়ে, ফলে ঘেরে ছাড়ার পর এগুলো দ্রুত রোগে আক্রান্ত হয়।

নিম্ন উৎপাদনশীলতা: অপর্যাপ্ত খাবার ও চাষীদের আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে বাংলাদেশে হেক্টরপ্রতি চিংড়ির উৎপাদন মাত্র ৫০০ কেজি, অথচ প্রতিবেশী দেশগুলোতে আধা-নিবিড় (সেমি-ইনটেনসিভ) পদ্ধতিতে হেক্টরপ্রতি উৎপাদন প্রায় ১২-১৩ হাজার কেজি।

চাষী পর্যায়ে সুযোগ-সুবিধার অভাব: প্রান্তিক চাষীরা বিদ্যুৎ সুবিধা, ব্যাংক ঋণ, মানসম্মত পোনা, সুলভ মূল্যে খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা পান না।

অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি: দেশে চিংড়ি মাছের

এরপর » পৃষ্ঠা ৪

স্থানীয় চাহিদা ও ভোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় চাষী পর্যায়ে মাছের দাম বেড়েছে, যা আন্তর্জাতিক রফতানি মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে না।

সম্ভাবনা ও উত্তরণের উপায়

চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে, যা সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজে লাগানো সম্ভব।

'ন্যাচারালি গ্রোন' বা প্রাকৃতিক চিংড়ির ব্র্যান্ডিং

বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি বড় বড় ঘেরে প্রাকৃতিকভাবে বড় হয়, যেখানে কৃত্রিম খাবার বা ফার্টিলাইজার ব্যবহার করা হয় না। এর ফলে আমাদের চিংড়ির স্বাদ অনন্য এবং এটি প্রায় 'ওয়াইল্ড টেস্ট' বা প্রাকৃতিক স্বাদের। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিদর্শকরাও এ স্বাদের প্রশংসা করেছেন। আমরা যদি এটিকে 'ন্যাচারালি গ্রোন' হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্র্যান্ডিং করতে পারি, তবে ইউরোপের বাজার থেকে প্রিমিয়াম প্রাইস আদায় করা সম্ভব।

ইউরোপে ডেডিকেটেড ডেক্স ও ব্রান্ডিং উদ্যোগ

ইউরোপের বাজারে আমাদের চিংড়ি প্রচারের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট ডেস্ক বা স্থায়ী উইং নেই। শেনজেন জোনের সুবিধা নিয়ে ইউরোপের একটি কেন্দ্রবিন্দুতে যদি প্রচার ও ব্র্যান্ডিং ক্যাম্পেইন চালানো যায়, তবে রফতানি অনেক বাড়ানো সম্ভব।

পণ্য বহুমুখীকরণ ও সার্টিফিকেশন

ইউরোপের ক্রেতারা বর্তমানে বহুবিধ ও ডাইভার্সিফায়েড ভ্যালু অ্যাডেড প্রডাক্ট চান। একই সঙ্গে চিংড়ি উৎপাদনের ক্ষেত্রটির নির্ভরযোগ্যতা (Traceability) এবং আন্তর্জাতিকভাবে সার্টিফায়েড বা মানসম্মত কোয়ালিটি বজায় রাখা জরুরি।

'ইম্পোর্ট টু এক্সপোর্ট' পলিসি

চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত কারখানাগুলো বর্তমানে কাঁচামালের অভাবে তাদের মোট উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ১০-১৫ শতাংশ ব্যবহার করতে পারছে। এ সক্ষমতা বাড়াতে এবং কারখানাগুলোকে লাভজনক করতে কাঁচামাল আমদানি করে, সেটিকে ভ্যালু অ্যাডিশনের মাধ্যমে পুনরায় রফতানি করার নীতি (যেমনটি চীন বা ইন্দোনেশিয়া করে) গ্রহণ করা যেতে পারে।

সরকারি নীতি সহায়তা ও খরচ হ্রাস

শিপমেন্ট ও ট্রান্সপোর্টেশন খরচ অনেক বেশি। সরকার যদি রফতানিকারক ও প্রসেসরদের নীতি সহায়তা দেয় এবং চুক্তিভিত্তিক চাষের মাধ্যমে কাঁচামাল উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে, তবে দেশের চিংড়ি রফতানি ১ বিলিয়ন ডলারের সরকারি লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের চিংড়ি খাতকে টিকিয়ে রাখতে এবং ইউরোপের বাজারে আমাদের অবস্থান পুনরুদ্ধার করতে হলে মাঠপর্যায়ের চাষীদের প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদান, ভাইরাসমুক্ত মানসম্মত পোনা সরবরাহ এবং বিশ্ববাজারে প্রাকৃতিক চিংড়ি হিসেবে সঠিক ব্র্যান্ডিং প্রয়োজন। তবেই যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে এবং কাঙ্ক্ষিত মূল্যে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের চিংড়ি রফতানি পুনরায় গতিশীল হবে।

লেখক: বিজনেস ডিরেক্টর, এসিআই এগ্রোলিংক লিমিটেড

বণিক বার্তা
24 AUG 2026

ইউরোপের বাইসাইকেল বাজারে ১৫০ বিলিয়ন ডলারের সম্ভাবনা

» ১৯৯৯ সালে বাইসাইকেল রফতানির ভিত্তি
» মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান ভূঁইয়ার উদ্যোগ
» প্রথম ক্রয়াদেশ যুক্তরাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদক

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে বাইসাইকেলভিত্তিক তেমন কোনো শিল্প-কারখানা ছিল না। এক কথায় বাইসাইকেল ছিল প্রায় আমদানিনির্ভর পণ্য। নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে এ চিত্র বদলাতে শুরু করে। ১৯৯৯ সালে মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ভূঁইয়ার নিজস্ব উদ্যোগে বাংলাদেশ থেকে বাইসাইকেল রফতানির ভিত্তি স্থাপিত হয়। যুক্তরাজ্যের বাজারে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কনসেপ্ট সাইক্লিংয়ের কাছে প্রথম এক হাজার ইউনিট বাইসাইকেল রফতানির আদেশ পাওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয় এ যাত্রা।

এরপর ধারাবাহিকভাবে খাতটি এগোতে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ২০টি বাইসাইকেল ও বাইসাইকেল যন্ত্রাংশ উৎপাদক ও রফতানিকারক যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি দেশে বিভিন্ন ধরনের ও আকারের বাইসাইকেল ও ই-বাইক রফতানি করছে।

মিজানুর রহমান ভূঁইয়া
চেয়ারম্যান, মেঘনা গ্রুপ

শুরুতে বাংলাদেশ থেকে বাইসাইকেল রফতানির পরিমাণ ৫ থেকে ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ধীরে ধীরে তা বেড়ে ২০২১-২২ সালে সর্বোচ্চ ১৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে বাইসাইকেল রফতানির পরিমাণ ছিল ১৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আগামীতে এ পরিমাণ আরো বেড়ে ১৭০ থেকে ১৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

মেঘনা গ্রুপের চিফ অপারেটিং অফিসার লুৎফুল বারীর মতে, এরই মধ্যে বাইসাইকেল খাতে রফতানির পরিমাণ, গুণগত মান, নকশা ও মূল্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। তবে প্রচলিত বাইসাইকেলের আন্তর্জাতিক বাজার দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। পক্ষান্তরে ই-বাইকের আন্তর্জাতিক বাজার বহুলাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকেও এরই মধ্যে ইউরোপের বাজারে ই-বাইক রফতানি শুরু হয়েছে, যদিও এর পরিমাণ এখনো কম।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে বর্তমানে গড় বাইসাইকেলের মূল্য প্রায় ৪৫২ মার্কিন ডলার। ইউরোপের সবচেয়ে বড় তিনটি বাইসাইকেল ক্রেতাদেশ হলো যথাক্রমে জার্মানি, নেদারল্যান্ডস ও ফ্রান্স।

আন্তর্জাতিক বাজারের এ পরিবর্তনের মধ্যেই বাংলাদেশের সামনে বড় সম্ভাবনা দেখছেন লুৎফুল বারী। তার হিসাবে, ২০২৬ সালে বাইসাইকেলের আন্তর্জাতিক বাজার প্রায় ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। ২০৩০ সালে তা ১৫০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রচলিত বাইসাইকেল রফতানিতে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ।

এত বড় বাজারের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে ইবিএর আওতায় বাংলাদেশের শুল্কমুক্ত সুবিধা এবং চীনের ওপর আরোপিত ৪৮ দশমিক ৫ শতাংশ অ্যান্টি-ডাম্পিং সুবিধাকে কাজে লাগানো প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। এর মাধ্যমে ইউরোপে একটি স্থিতিশীল বাজারের সম্ভাবনা গড়ে তোলা সম্ভব। এলডিসি থেকে উত্তরণের পরও এ সুযোগ অব্যাহত রাখার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন তিনি। বর্তমানে বাংলাদেশের বাইসাইকেল রফতানির প্রায় ৯৮ শতাংশই ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে যাচ্ছে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানসহ মধ্যপ্রাচ্যের বাজারেও ব্যাপক সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান লুৎফুল বারী।

সম্ভাবনার পাশাপাশি এ খাতে বেশকিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কাঁচামাল আমদানিতে নির্ভরতা এবং স্থানীয়ভাবে কতিপয় যন্ত্রাংশ উৎপাদনে সীমাবদ্ধতা। প্রচলিত বাইসাইকেল আমদানিতে চাহিদার দুর্বলতাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

এলডিসি থেকে উত্তরণের পর ইউরোপীয় ইউনিয়নে কঠোর পরিপালন ও পণ্যের উৎপত্তি বিধির প্রয়োগ ও চাপ বাড়বে। চীনের ওপর বাইসাইকেল রফতানিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক কোনো কারণে উঠে গেলে বাংলাদেশের বাইসাইকেল রফতানিতে বড় ধরনের আঘাত আসতে পারে।

এছাড়া চীন, ভারত, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার সঙ্গে রফতানি বাজারে মূল্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে কঠিন প্রতিযোগিতার মোকাবেলা করতে হবে। ফলে ইউরোপের বড় বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান ধরে রাখা ও রফতানি বাড়ানোর ক্ষেত্রে সুযোগের পাশাপাশি এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

বণিক বার্তা
24 AUG 2026

যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য বহুমুখীকরণে এফএমসিজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে

রুহুল কুদ্দুস খান
চেয়ারম্যান, ইউনিলিভার কনজিউমার কেয়ার লিমিটেডের (ইউসিএল)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড

বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য বাণিজ্য সম্পর্ক ঐতিহাসিক, ক্রমবর্ধমান ও সম্ভাবনাময়। ২০২৬ সালের মার্চে শেষ হওয়া ১২ মাসে দ্বিপক্ষীয় পণ্য ও সেবা বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন পাউন্ড। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্যের আমদানি ছিল ৩ দশমিক ৮ বিলিয়ন পাউন্ড। তবে বাংলাদেশের রফতানি এখনো প্রধানত তৈরি পোশাককেন্দ্রিক। তাই পরবর্তী লক্ষ্য হওয়া উচিত পণ্য ও সেবা রফতানি বহুমুখীকরণ, দেশে উৎপাদন ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যের সঙ্গে বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি স্থানান্তরকে আরো কার্যকরভাবে যুক্ত করা।

আমার মতে, এ বাণিজ্য বহুমুখীকরণে এফএমসিজি খাতও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ এ খাতের সঙ্গে স্থানীয় উৎপাদন, কাঁচামাল ও প্যাকেজিং সরবরাহকারী, প্রযুক্তি, লজিস্টিকস এবং বিস্তৃত বিতরণ ব্যবস্থা যুক্ত। ইউনিলিভারের মতো দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী ও যুক্তরাজ্যভিত্তিক কোম্পানিগুলো আন্তর্জাতিক মান, প্রযুক্তি ও দক্ষতা স্থানান্তরের মাধ্যমে এফএমসিজি খাতের স্থানীয় সরবরাহকারী ও উৎপাদন ব্যবস্থার সক্ষমতা বাড়াতে পারে। ফলে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, বাংলাদেশে স্থানীয় উৎপাদন ও দক্ষ সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার যথেষ্ট সক্ষমতা রয়েছে। ইউনিলিভার বাংলাদেশে আমরা বাজার সম্প্রসারণের পাশাপাশি স্থানীয় উৎপাদন, সরবরাহকারী উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে ধারাবাহিকভাবে বিনিয়োগ করছি। বর্তমানে আমাদের ৯৬ শতাংশের বেশি পণ্য বাংলাদেশেই উৎপাদন হয়।

এলডিসি উত্তরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ এমন একটি পর্যায়ে প্রবেশ করবে, যেখানে বৈশ্বিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা করতে হবে উৎপাদনশীলতা, উদ্ভাবন, গুণগত মান, সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা এবং ব্যবসায়িক পরিবেশের ভিত্তিতে।

যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এলডিসি থেকে উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের বাজার সুবিধা পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবে না। ২০২৬ সালে উত্তরণ হলে যুক্তরাজ্যের ডেভেলপিং কান্ট্রিজ ট্রেডিং স্কিমে বাংলাদেশ ২০২৯ পর্যন্ত সর্বোচ্চ সুবিধা পাবে। এরপর এনহ্যান্সড প্রেফারেন্সেসে ৯২ শতাংশ পণ্যশ্রেণীতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক কোম্পানির জন্য এ উত্তরণ একদিকে চ্যালেঞ্জ, অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের সুযোগ। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বাজার ও তরুণ জনগোষ্ঠী এক্ষেত্রে বড় শক্তি। একই সঙ্গে কিছু বাস্তব চ্যালেঞ্জও রয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার প্রাপ্যতা, আমদানি করা কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির ব্যয়, জ্বালানি ও পরিবহন অবকাঠামো, কাস্টমস প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা, করনীতির পরিবর্তন এবং সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি বিনিয়োগের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে।

যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এলডিসি থেকে উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের বাজার সুবিধা পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবে না। ২০২৬ সালে উত্তরণ হলে যুক্তরাজ্যের ডেভেলপিং কান্ট্রিজ ট্রেডিং স্কিমে বাংলাদেশ ২০২৯ পর্যন্ত সর্বোচ্চ সুবিধা পাবে। এরপর এনহ্যান্সড প্রেফারেন্সেসে ৯২ শতাংশ পণ্যশ্রেণীতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক কোম্পানির জন্য এ উত্তরণ একদিকে চ্যালেঞ্জ, অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের সুযোগ

আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশে বিশ্বমানের উৎপাদন সম্ভব এবং ইউনিলিভারের কার্যক্রম তার উদাহরণ। তবে বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনে যুক্ত হতে শুধু উৎপাদন সক্ষমতা যথেষ্ট নয়। স্থানীয় কারখানা ও সরবরাহকারীদের গুণগত মান, প্রতিযোগিতামূলক ব্যয়, সময়মতো সরবরাহ, ট্রেসেবিলিটি এবং পরিবেশগত ও সামাজিক মান নিশ্চিত করতে হবে।

একই সঙ্গে কাঁচামাল, প্যাকেজিং, প্রকৌশল, পরিবহন ও ডিজিটাল সেবা সরবরাহকারীদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কারিগরি সহায়তা ও যৌথ উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভূমিকা রাখতে পারে। সরবরাহ ব্যবস্থাকে ডিজিটাল ও স্বচ্ছ করা, বন্দর ও কাস্টমসের দক্ষতা বাড়ানো এবং নির্ভরযোগ্য জ্বালানি নিশ্চিত করাও জরুরি।

বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনে যুক্ত হওয়ার সুযোগ শুধু তৈরি পণ্য রফতানিতে সীমাবদ্ধ নয়। প্যাকেজিং ডিজাইন, সফটওয়্যার, তথ্য বিশ্লেষণ, গবেষণা ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনার মতো সেবাতেও বাংলাদেশের সম্ভাবনা রয়েছে। যেখানে গুণগত মান, ব্যয় ও নির্ভরযোগ্যতায় প্রতিযোগিতা করা সম্ভব, সেখানে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সরবরাহকারী হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। এজন্য সরকার, বহুজাতিক কোম্পানি, স্থানীয় উদ্যোক্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

আমি তিনটি ক্ষেত্রে বিশেষ সম্ভাবনা দেখি। প্রথমত, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানিসাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও টেকসই প্যাকেজিংসহ সবুজ শিল্পায়ন। দ্বিতীয়ত, সফটওয়্যার, ফিনটেক, ডিজিটাল পেমেন্ট ও অন্যান্য জ্ঞানভিত্তিক সেবা। তৃতীয়ত, ওষুধ, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, উন্নত উৎপাদন, লজিস্টিকস, উচ্চ শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন।

এসব সম্ভাবনা কাজে লাগাতে ব্যবসায়িক পরিবেশে পূর্বানুমানযোগ্যতা জরুরি। তিন থেকে পাঁচ বছরের একটি সুস্পষ্ট কর ও শুল্ক রোডম্যাপ বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় সহায়তা করবে। একই সঙ্গে ব্যবসা নিবন্ধন, লাইসেন্স, কাস্টমস, কর নিরীক্ষা ও বৈধ অর্থ প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়া ডিজিটাল, স্বচ্ছ ও সময়সীমাবদ্ধ করতে হবে। নির্ভরযোগ্য জ্বালানি, দক্ষ বন্দর ও লজিস্টিকস এবং কাঁচামাল ও প্রযুক্তি আমদানির যৌক্তিক শুল্ক কাঠামোও প্রয়োজন। এজন্য সরকার ও বেসরকারি খাতের মধ্যে নিয়মিত ও তথ্যভিত্তিক সংলাপ জোরদার করতে হবে।

বণিক বার্তা
24 AUG 2026

সাইকেল রফতানিতে তৃতীয়

ইউরোপের রাস্তায় ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ সাইকেল

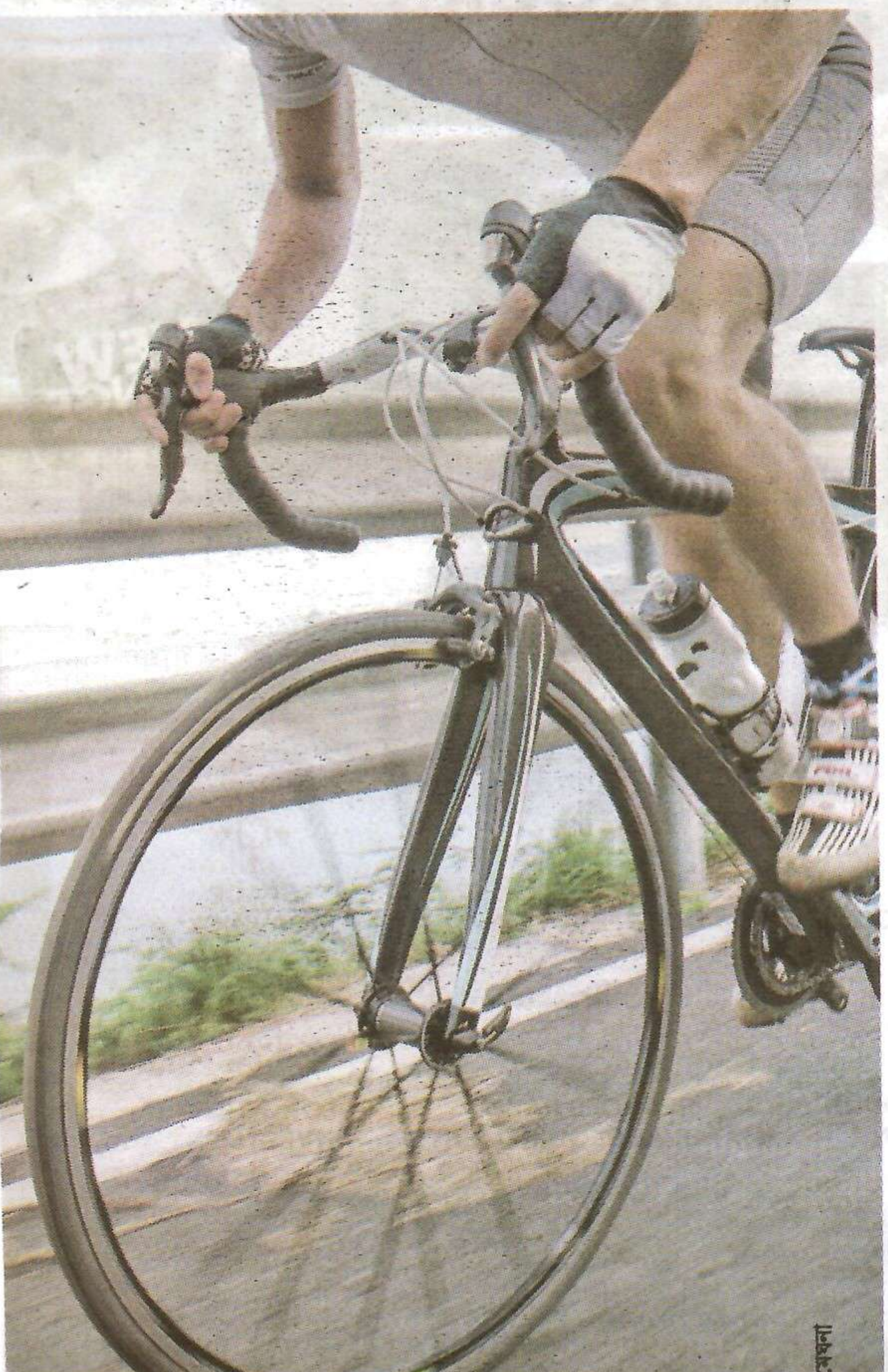

ছবি : মেঘনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ইউরোপের ব্যস্ত রাস্তাগুলোয় বর্তমানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ লেখা বাইসাইকেল। একসময় ৪০-৫০ শতাংশ যন্ত্রাংশ বাইরে থেকে আমদানি করতে হতো, কিন্তু আজ বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশ এক নতুন পরিচয়ের সূচনা করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ২৭টি দেশে সাইকেল রফতানিতে বাংলাদেশ এখন তৃতীয় এবং বৈশ্বিক তালিকায় অষ্টম অবস্থানে রয়েছে। এ সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে প্রবাসফেরত শ্রমিকদের দক্ষতা, দেশীয় শিল্পোদ্যোক্তাদের সাহস এবং আন্তর্জাতিক বাজারের সুযোগ।

বাংলাদেশের বাইসাইকেল শিল্পের যাত্রা বেশ বর্ণিল। নব্বইয়ের দশকে মালয়েশিয়ায় শ্রমিক সংকটের কারণে আকোকো নামের একটি সাইকেল কারখানার মালিক তার কারখানা বাংলাদেশে স্থানান্তরের পরিকল্পনা করেন। পরবর্তী সময়ে মালয়েশিয়াফেরত কয়েকজন দক্ষ শ্রমিকের ওপর নির্ভর করে ১৯৯৫ সালে চট্টগ্রাম রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) যাত্রা শুরু করে দেশের প্রথম রফতানিমুখী কারখানা ‘আলিটা বাংলাদেশ লিমিটেড’। প্রাথমিক অবস্থায় গুণমান প্রমাণ ও ইউরোপে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি চ্যালেঞ্জিং হলেও ১৯৯৭ সাল থেকে চিত্র দ্রুত বদলাতে থাকে।

আলিটার সাফল্যের পর স্থানীয় শিল্পগোষ্ঠীগুলোও এ সম্ভাবনাময় খাতে বিনিয়োগ শুরু করে। ২০০৩ সালে দেশের অন্যতম শীর্ষ প্রতিষ্ঠান মেঘনা গ্রুপ প্রথম বাইসাইকেল রফতানি শুরু করে। পরবর্তী সময়ে ২০১৪ সালে দুরন্ত ব্র্যান্ড নিয়ে মাঠে নামে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ। বর্তমানে জার্মান-বাংলা, করভো, নর্থ বেঙ্গলের মতো প্রায় ছয়টি বড় প্রতিষ্ঠান দেশে আন্তর্জাতিক মানের বাইসাইকেল উৎপাদন করছে।

ইউরোস্ট্যাট ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, ২০০৭ সালে বাংলাদেশ প্রায় সাড়ে তিন লাখ বাইসাইকেল রফতানি করেছিল। ২০১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৬ লাখে। ২০২০-২১ অর্থবছরে রফতানি হয় প্রায় ১০ লাখ সাইকেল। ওই অর্থবছরে রফতানি আয় ছিল ১৩ কোটি ৮ লাখ ডলার। আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি ছিল ৫৮ শতাংশের বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরে রফতানি আরো বেড়ে প্রায় ১৭ কোটি ডলারে পৌঁছায়। এরপর অবশ্য দুই বছর রফতানি কমে যায়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা নেমে আসে প্রায় ৮ কোটি ২৫ লাখ ডলারে। তবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পুণরায় ঘুরে দাঁড়ায় এ খাত। রফতানি বেড়ে হয় ১[illegible] কোটি ৬৪ লাখ ডলার। প্রবৃদ্ধি ছিল ৪১ শতাংশ।

এ ঘুরে দাঁড়ানোর পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে মেঘনা গ্রুপ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটির সাইকেল রফতানি ছিল ৭ কোটি ৮১ লাখ ডলার। অর্থাৎ ওই অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট সাইকেল রফতানির প্রায় ৬৭ শতাংশ এসেছে মেঘনা গ্রুপ থেকে। প্রতিষ্ঠানটির তথ্য অনুযায়ী, তাদের কারখানায় বছরে প্রায় ৮০ লাখ সাইকেল উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে। জার্মানি, যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম ও ডেনমার্কের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জন্যও সাইকেল তৈরি করে তারা।

বাংলাদেশের তৈরি সাইকেলের সবচেয়ে বড় বাজার ইউরোপ। লাইটক্যাসল পার্টনার্সের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০২২ সালে বাংলাদেশের মোট বাইসাইকেল রফতানির ৬৭ দশমিক [illegible] শতাংশের গন্তব্য ছিল ইইউ। ওই বছর ইইউভুক্ত দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে ১০ কোটি ৪[illegible] লাখ ডলারের সাইকেল আমদানি করে। সবচেয়ে বড় ক্রেতা ছিল জার্মানি। দেশটি বাংলাদেশের মোট সাইকেল রফতানির ৪৬ শতাংশ হিস্যা দখল করেছে। এছাড়া অস্ট্রিয়া, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, সুইডেন, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইতালি ও স্পেনেও বাংলাদেশী সাইকেল যায়।

ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের অন্যতম সুবিধা হলো শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা। পাশাপাশি চীনা সাইকেলের ওপর ইইউর অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্কও বাংলাদেশের রফতানিকারকদের কিছুটা সুবিধা দিচ্ছে। বিশ্বজুড়ে পরিবেশবান্ধব যাতায়াতের চাহিদা বাড়ায় সাইকেলের বাজারেও নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

সেই সুযোগে নতুন সম্ভাবনার জায়গা তৈরি করছে বৈদ্যুতিক সাইকেল। লাইটক্যাসলের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে প্রাণ-আরএফএল জার্মানিতে বৈদ্যুতিক সাইকেল রফতানি শুরু করে। ইউরোপে এ পণ্যের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সাধারণ সাইকেলের পাশাপাশি উচ্চমূল্যের বৈদ্যুতিক সাইকেলও ভবিষ্যতে রফতানি আয়ের বড় উৎস হতে পারে।

এই কাজে চ্যালেঞ্জও কম নয়। এখনো সাইকেলের কিছু যন্ত্রাংশ আমদানি করতে হয়। অচিরে উৎপাদন খরচ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নত যন্ত্রাংশ তৈরির সক্ষমতা বাড়াতে হবে। এসব ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলে ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান আরো শ[illegible] হবে। ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ সাইকেল তখন শুধু একটি রফতানি পণ্য নয়, দেশের শি[illegible] সক্ষমতারও পরিচয় হয়ে উঠতে পারে।

বণিক বার্তা
24 AUG 2025

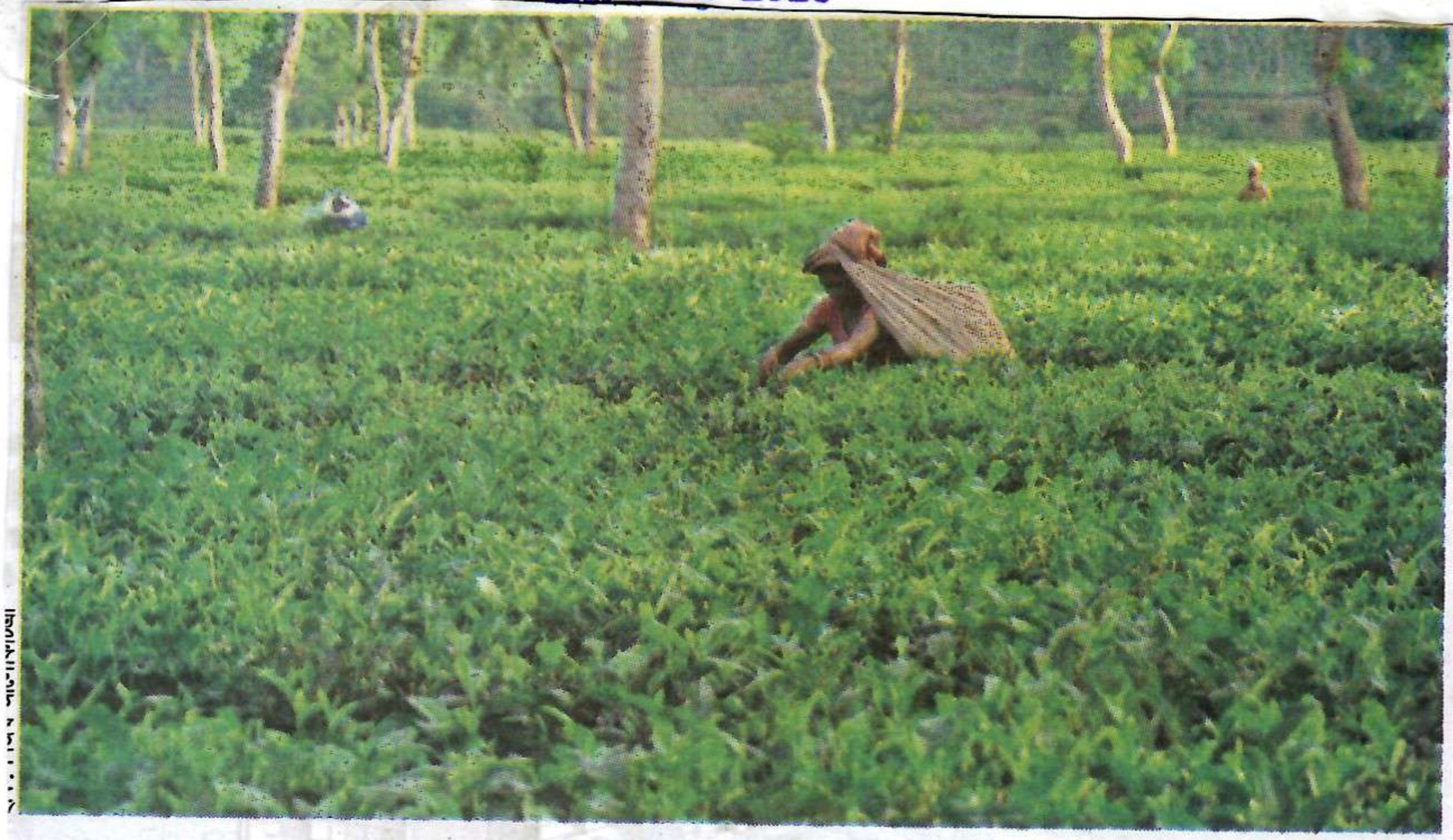

চা শতবর্ষী বাংলাদেশী রফতানি পণ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

আজকের বাংলাদেশ একসময় বৈশ্বিক চা বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি কেন্দ্র ছিল। ১০০ বছরেরও বেশি আগে সিলেট, চট্টগ্রাম অঞ্চলের চা ছিল এখানকার প্রধান রফতানি পণ্য। উৎপাদিত চায়ের বড় অংশ চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে জাহাজে তুলে পাঠানো হতো ইউরোপের বাজারে। ঐতিহাসিক নথিতে এমনকি চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে সিলেটের বাণিজ্যিক যোগাযোগের প্রধান পণ্য হিসেবেও চায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক চা চাষের ইতিহাস প্রায় দুই শতাব্দীর। ১৮৪০ সালে চট্টগ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে চা উৎপাদন শুরু হয়। এরপর ১৮৫৪ সালে সিলেটের মালনীছড়া চা বাগানে বাণিজ্যিকভাবে চা উৎপাদন শুরু হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ চা-করদের উদ্যোগে সিলেটের টিলা অঞ্চলে দ্রুত চা বাগান বিস্তার লাভ করে। স্থানীয় মানুষের মধ্যে চা পানের আকর্ষণ না থাকলেও ইউরোপীয়রা নিজেদের চায়ের স্বাদ আস্বাদনে এখানকার চা উপযোগী পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে চাষ এবং চাষ-পরবর্তী ইউরোপে সরবরাহ শুরু করে।

উনিশ শতকের শেষদিকে সিলেটের চায়ের উৎপাদন দ্রুত বাড়তে থাকে। ইউরোপীয় ক্রেতাদের চাহিদার কথা বিবেচনায় ১৮৯৩ সালে সিলেটে প্রায় ২ কোটি ৬ লাখ পাউন্ড চা উৎপাদিত হয়েছিল। ১৯০০ সালে উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড। ওই সময় সিলেট আসাম প্রদেশের অন্যতম প্রধান চা উৎপাদনকারী অঞ্চলে পরিণত হয়। ১৯০৪-০৫ সালে সিলেটে ১২৩টি চা বাগানের মধ্যে ১১০টির মালিকানা ছিল ইউরোপীয়দের হাতে। মূলত সিলেটের সঙ্গে চট্টগ্রামের রেলপথের যোগাযোগ তৈরির মূল কারণ ছিল বন্দর দিয়ে ইউরোপে চা রফতানি।

ঔপনিবেশিক আমলে বাংলাদেশের চা বাগানের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় ব্রিটিশ ও ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর মধ্যে ছিল জেমস ফিনলে, অক্টাভিয়াস স্টিল অ্যান্ড কোম্পানি, ম্যাকলিওড অ্যান্ড কোম্পানি, শ' অ্যান্ড ওয়ালেস, বারলো অ্যান্ড কোম্পানি, ডানকান ব্রাদার্স, প্লান্টার্স স্টোরস অ্যান্ড এজেন্সিজ, কিং হ্যামিলটন অ্যান্ড কোম্পানি, ব্যারি অ্যান্ড কোম্পানি, উইলিয়ামসন অ্যান্ড ম্যাগর, জে. ম্যাকিলিক্যান, ম্যাকনিল, অ্যান্ড্রু ইউল, গ্রিন্ডলে ও কিলবার্ন কোম্পানি। ১৯১০ সালের হিসাবে এসব ইউরোপীয় কোম্পানি ও এজেন্সি হাউজের নিয়ন্ত্রণে সিলেট অঞ্চলে প্রায় ৬৮ হাজার ৭৩৭ একর চা-জমি ছিল।

১৯০৫-০৬ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সিলেট থেকে ২ লাখ ৪৪ হাজার ৬৩৯ মণ চা রফতানি হয়েছিল। একই সময়ে আসাম থেকে রফতানি হয়েছিল ২ লাখ ৪ হাজার ৫৪৮ মণ। অর্থাৎ তৎকালীন সিলেট শুধু স্থানীয় নয়, বৃহত্তর আসাম-বঙ্গ অঞ্চলেরও গুরুত্বপূর্ণ চা রফতানি কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ওই সময়ে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর মধ্যে জেমস ফিনলে বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে ফিনলে কোম্পানির চায়ের বাজার যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় বিস্তৃত হয়। অর্থাৎ সিলেটের চা তখন কেবল ব্রিটিশ বাজারেই সীমাবদ্ধ ছিল না; ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এর বাজার তৈরি হয়েছিল।

এরপর » পৃষ্ঠা ১৬

ISPAHANI
Original Finlay
KAZI & KAZI TEA
SEYLON TEA

ঔপনিবেশিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় লন্ডন ছিল চায়ের অন্যতম প্রধান আন্তর্জাতিক বাজার। ১৯৪৭ সালের আগে চা কেনাবেচা ও নিলামের মূল কেন্দ্রগুলোর একটি ছিল লন্ডন। ভারত ভাগের পরও ব্রিটিশ চা-কর ও পুঁজিপতিরা লন্ডনের বাজারের সঙ্গে তাদের ব্যবসায়িক যোগাযোগ ধরে রাখেন। পরে কলকাতা ও চট্টগ্রামেও চায়ের নিলাম বাজার গড়ে ওঠে। যার কারণে ১৯৪৭ সালের পরও দীর্ঘসময় এখানকার চা আন্তর্জাতিক নিলামের মাধ্যমে ইউরোপের বাজারে সহজেই প্রবেশের সুযোগ পেয়েছিল।

তবে বাংলাদেশের চা শিল্পের সেই রফতানিমুখী চরিত্র সময়ের সঙ্গে বদলে গেছে। স্বাধীনতার পর দেশের জনসংখ্যা ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা পাশাপাশি ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশীয় চা রফতানি বাজার এখনো ধরে রেখেছে বিপণন কোম্পানিগুলো। বিশেষ করে সাইপ্রাস, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, ফিনল্যান্ড, গ্রিস, ইতালি, আয়ারল্যান্ড, লন্ডন, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, ইউক্রেন, স্পেন, জার্মানিসহ বিভিন্ন দেশে অনিয়মিতভাবে চা রফতানি করে দেশের শীর্ষস্থানীয় উৎপাদক, মোড়কজাত ও বাজারজাতকারী কোম্পানিগুলো। চীন, ভারতসহ বিভিন্ন দেশের বিশেষায়িত চায়ের পরিবর্তে বাংলাদেশের ব্ল্যাক টি সবচেয়ে বেশি রফতানি হয় ইউরোপে। সীমিত পরিসরে গ্রীন টি, অর্থডক্স টি রফতানি হলেও সাম্প্রতিক সময়ে মসলাসহ বিভিন্ন ফ্লেভারের টি প্রায় তিন গুণ উৎপাদন সত্ত্বেও দেশীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আমদানি করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। যার কারণে ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশী চায়ের চাহিদা থাকলেও দামের কারণে ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে রফতানির সুযোগ তৈরি হচ্ছে না। তাছাড়া বর্তমানে দেশে উৎপাদিত চায়ের ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতি, কীটনাশক ও রেইন ফরেস্ট প্রতিবেদনসংক্রান্ত জটিলতা রফতানিতে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশীয় চা-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ উৎপাদনে চায়ের বৈচিত্র্য এনেছে। বিশেষ করে গ্রীন টি, অর্থডক্স টি, মসলা ও বিভিন্ন ফল ও ফুলের চা উৎপাদন ও বাজারজাত শুরু হয়েছে। সিলেটের

চা শতবর্ষী বাংলাদেশী রফতানি পণ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক

আজকের বাংলাদেশ একসময় বৈশ্বিক চা বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি কেন্দ্র ছিল। ১০০ বছরেরও বেশি আগে সিলেট, চট্টগ্রাম অঞ্চলের চা ছিল এখানকার প্রধান রফতানি পণ্য। উৎপাদিত চায়ের বড় অংশ চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে জাহাজে তুলে পাঠানো হতো ইউরোপের বাজারে। ঐতিহাসিক নথিতে এমনকি চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে সিলেটের বাণিজ্যিক যোগাযোগের প্রধান পণ্য হিসেবেও চায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক চা চাষের ইতিহাস প্রায় দুই শতাব্দীর। ১৮৪০ সালে চট্টগ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে চা উৎপাদন শুরু হয়। এরপর ১৮৫৪ সালে সিলেটের মালনীছড়া চা বাগানে বাণিজ্যিকভাবে চা উৎপাদন শুরু হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ চা-করদের উদ্যোগে সিলেটের টিলা অঞ্চলে দ্রুত চা বাগান বিস্তার লাভ করে। স্থানীয় মানুষের মধ্যে চা পানের আকর্ষণ না থাকলেও ইউরোপীয়রা নিজেদের চায়ের স্বাদ আস্বাদনে এখানকার চা উপযোগী পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে চাষ এবং চাষ-পরবর্তী ইউরোপে সরবরাহ শুরু করে।

উনিশ শতকের শেষদিকে সিলেটের চায়ের উৎপাদন দ্রুত বাড়তে থাকে। ইউরোপীয় ক্রেতাদের চাহিদার কথা বিবেচনায় ১৮৯৩ সালে সিলেটে প্রায় ২ কোটি ৬ লাখ পাউন্ড চা উৎপাদিত হয়েছিল। ১৯০০ সালে উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড। ওই সময় সিলেট আসাম প্রদেশের অন্যতম প্রধান চা উৎপাদনকারী অঞ্চলে পরিণত হয়। ১৯০৪-০৫ সালে সিলেটে ১২৩টি চা বাগানের মধ্যে ১১০টির মালিকানা ছিল ইউরোপীয়দের হাতে। মূলত সিলেটের সঙ্গে চট্টগ্রামের রেলপথের যোগাযোগ তৈরির মূল কারণ ছিল বন্দর দিয়ে ইউরোপে চা রফতানি।

ঔপনিবেশিক আমলে বাংলাদেশের চা বাগানের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় ব্রিটিশ ও ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর মধ্যে ছিল জেমস ফিনলে, অক্টাভিয়াস স্টিল অ্যান্ড কোম্পানি, ম্যাকলিওড অ্যান্ড কোম্পানি, শ' অ্যান্ড ওয়ালেস, বারলো অ্যান্ড কোম্পানি, ডানকান ব্রাদার্স, প্লান্টার্স স্টোরস অ্যান্ড এজেন্সিজ, কিং হ্যামিলটন অ্যান্ড কোম্পানি, ব্যারি অ্যান্ড কোম্পানি, উইলিয়ামসন অ্যান্ড ম্যাগর, জে. ম্যাকিলিক্যান, ম্যাকনিল, অ্যান্ড্রু ইউল, গ্রিন্ডলে ও কিলবার্ন কোম্পানি। ১৯১০ সালের হিসাবে এসব ইউরোপীয় কোম্পানি ও এজেন্সি হাউজের নিয়ন্ত্রণে সিলেট অঞ্চলে প্রায় ৬৮ হাজার ৭৩৭ একর চা-জমি ছিল।

১৯০৫-০৬ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সিলেট থেকে ২ লাখ ৪৪ হাজার ৬৩৯ মণ চা রফতানি হয়েছিল। একই সময়ে আসাম থেকে রফতানি হয়েছিল ২ লাখ ৪ হাজার ৫৪৮ মণ। অর্থাৎ তৎকালীন সিলেট শুধু স্থানীয় নয়, বৃহত্তর আসাম-বঙ্গ অঞ্চলেরও গুরুত্বপূর্ণ চা রফতানি কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ওই সময়ে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর মধ্যে জেমস ফিনলে বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে ফিনলে কোম্পানির চায়ের বাজার যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় বিস্তৃত হয়। অর্থাৎ সিলেটের চা তখন কেবল ব্রিটিশ বাজারেই সীমাবদ্ধ ছিল না; ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এর বাজার তৈরি হয়েছিল।

এরপর » পৃষ্ঠা ১৬

ঔপনিবেশিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় লন্ডন ছিল চায়ের অন্যতম প্রধান আন্তর্জাতিক বাজার। ১৯৪৭ সালের আগে চা কেনাবেচা ও নিলামের মূল কেন্দ্রগুলোর একটি ছিল লন্ডন। ভারত ভাগের পরও ব্রিটিশ চা-কর ও পুঁজিপতিরা লন্ডনের বাজারের সঙ্গে তাদের ব্যবসায়িক যোগাযোগ ধরে রাখেন। পরে কলকাতা ও চট্টগ্রামেও চায়ের নিলাম বাজার গড়ে ওঠে। যার কারণে ১৯৪৭ সালের পরও দীর্ঘসময় এখানকার চা আন্তর্জাতিক নিলামের মাধ্যমে ইউরোপের বাজারে সহজেই প্রবেশের সুযোগ পেয়েছিল।

তবে বাংলাদেশের চা শিল্পের সেই রফতানিমুখী চরিত্র সময়ের সঙ্গে বদলে গেছে। স্বাধীনতার পর দেশের জনসংখ্যা ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা দ্রুত বাড়ায় উৎপাদিত চায়ের বড় অংশ দেশের বাজারেই ব্যবহৃত হতে থাকে। বাংলাপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ প্রায় চার কোটি কেজি চা উৎপাদন করে ৩ কোটি ১০ লাখ কেজি রফতানি করেছিল। বিপরীতে পরবর্তী সময়ে উৎপাদন বাড়লেও রফতানি ব্যাপকভাবে কমে যায়। বাংলাদেশে ১৭২টি বাগান ছাড়াও বিপুল পরিমাণ ক্ষুদ্রায়তন চা চাষী বছরে ১০ কোটি কেজিরও বেশি চা উৎপাদন করে, যার সিংহভাগই দেশীয় ভোক্তাদের চাহিদা মেটায়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাচীন চট্টগ্রাম চা নিলাম কেন্দ্র ছাড়াও শ্রীমঙ্গল ও পঞ্চগড়ে চা নিলাম বাজার অনুষ্ঠিত হয়। ১৬টি বাগান নিয়ে ডানকান ব্রাদার্সই ইউরোপীয় কোম্পানি হিসেবে বাংলাদেশে চায়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

পাশাপাশি ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশীয় চা রফতানি বাজার এখনো ধরে রেখেছে বিপণন কোম্পানিগুলো। বিশেষ করে সাইপ্রাস, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, ফিনল্যান্ড, গ্রিস, ইতালি, আয়ারল্যান্ড, লন্ডন, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, ইউক্রেন, স্পেন, জার্মানিসহ বিভিন্ন দেশে অনিয়মিতভাবে চা রফতানি করে দেশের শীর্ষস্থানীয় উৎপাদক, মোড়কজাত ও বাজারজাতকারী কোম্পানিগুলো। চীন, ভারতসহ বিভিন্ন দেশের বিশেষায়িত চায়ের পরিবর্তে বাংলাদেশের ব্ল্যাক টি সবচেয়ে বেশি রফতানি হয় ইউরোপে। সীমিত পরিসরে গ্রীন টি, অর্থডক্স টি রফতানি হলেও সাম্প্রতিক সময়ে মসলাসহ বিভিন্ন ফ্লেবারের টি ইউরোপের বাজারে রফতানির সুযোগ পাচ্ছে। সর্বশেষ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ইউরোপীয় বাজারের মধ্যে সাইপ্রাসে রফতানি হয়েছে তিন হাজার কেজি। এছাড়া ফ্রান্সে এক হাজার কেজি, ইতালিতে এক হাজার কেজি চা রফতানি হয়েছে। গ্রিস, পর্তুগাল, স্পেন, যুক্তরাজ্য ও ডেনমার্কেও চা রফতানি হয়েছে। খোলা চায়ের তুলনায় মোড়কজাত ভ্যালু অ্যাডেড চা-ই ইউরোপের বাজারে বিভিন্ন দেশে রফতানির সুযোগ তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠীকে সামনে রেখে রফতানি হলেও ইউরোপীয় দেশগুলোতে অতীতের এখানকার চায়ের সঙ্গে পরিচিতি বাংলাদেশের চায়ের নতুন সম্ভাবনা হিসেবে দেখছেন উদ্যোক্তারা।

বতর্মানে ইস্পাহানি, আবুল খায়ের, কাজী

প্রায় তিন গুণ উৎপাদন সত্ত্বেও দেশীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আমদানি করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। যার কারণে ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশী চায়ের চাহিদা থাকলেও দামের কারণে ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে রফতানির সুযোগ তৈরি হচ্ছে না। তাছাড়া বর্তমানে দেশে উৎপাদিত চায়ের ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতি, কীটনাশক ও রেইন ফরেস্ট প্রতিবেদনসংক্রান্ত জটিলতা রফতানিতে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশীয় চা-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ উৎপাদনে চায়ের বৈচিত্র্য এনেছে। বিশেষ করে গ্রীন টি, অর্থডক্স টি, মসলা ও বিভিন্ন ফল ও ফুলের চা উৎপাদন ও বাজারজাত শুরু হয়েছে। সিলেটের সাতকরা চা, আদা, তুলসী, বিশেষ বিশেষ ধরনের গ্রীন টি তৈরি করে দেশের বাজারের পাশাপাশি ইউরোপসহ পশ্চিমা বিভিন্ন দেশে রফতানি হচ্ছে। তবে উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ায় এসব চায়ের বাজার থাকলেও রফতানিতে বেগ পেতে হচ্ছে রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোকে। এক্ষেত্রে দেশীয় চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে দামের প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না বাংলাদেশের চা। ফলে ইউরোপের বাজারে চাহিদা থাকলেও বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বসবাসকারীদের চাহিদাকে পুঁজি করে সীমিত আকারে ইউরোপে চা রফতানি বাজার ধরে রেখেছে বাংলাদেশ।

চা বোর্ডের তথ্যমতে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে

বণিক বার্তা
24 AUG 2026

ইউরোপে বাংলা
পোশাক র

ওভেন

ইইউ দেশ	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
অস্ট্রিয়া	১২.৩৯	২১.০৭
বেলজিয়াম	১৭৬.৪৫	২১৪.৫৪
বুলগেরিয়া	০.৪৭	১.১৫
ডেনমার্ক	৩৬২.৬২	৩৬৫.৫৩
ফিনল্যান্ড	৮.৪৪	৯.০৪
ফ্রান্স	৮০২.৯০	৮৩৪.৮৭
জার্মানি	১৭৬১.০৮	১৮৮৬.৫৬
গ্রিস	১৪.৬৭	১৪.৮১
ইতালি	৫৬১.৮১	৫৮০.১৯
আয়ারল্যান্ড	৯১.২৪	৯০.১৬
নেদারল্যান্ডস	৭৯৭.০৯	৮৬৯.১১
পর্তুগাল	৩৬.৩৮	৩৬.০৯
রোমানিয়া	৩৮.৬৭	৭২.৫০
স্পেন	১৫১৮.৬৮	১৪৪৯.৬৩
সুইডেন	২৪৫.২৮	২৯৪.৩৮
সাইপ্রাস	০.৩০	০.৬৯
চেক প্রজাতন্ত্র	১২৫.১৬	১৪৬.২৬
এস্তোনিয়া	০.০৫	০.০৬
হাঙ্গেরি	৪৩.৭০	৪১.০৭
লাটভিয়া	০.১৭	০.১৭
লিথুয়ানিয়া	০.০৯	০.১৭
মাল্টা	০.৩২	০.৫২
পোল্যান্ড	৫৭৯.১৯	৬৭১.৪০
স্লোভাকিয়া	২১.১৯	২৩.৪৮
স্লোভেনিয়া	১৭.৬৫	২৮.১৩
ক্রোয়েশিয়া	২২.৮২	২৬.৭৫
লুক্সেমবার্গ	২.২৭	১.০৬
সাব-টোটাল (ইইউ)	৭২৪১.০৫	৭৬৭৯.৩৬
বিশ্বের মোট রফতানিতে ইইউ (%)	৪২.৯২	৪২.২২
শতকরা প্রবৃদ্ধি	-০.৪৫	৬.০৫
যুক্তরাজ্য	১৬৮৭.৩৬	১৬৯১.২৭
যুক্তরাজ্যের (%)	১০.০০	৯.৩০
শতকরা প্রবৃদ্ধি	-০.২১	০.২৩
সর্বমোট	১৬৮৬৯.২	১৮১৮৭.৯
শতকরা প্রবৃদ্ধি	-৫.৩২	৭.৮২

সূত্র : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বিজিএমইএ কর্তৃক সংকলিত

বণিক বার্তা
24 AUG 2026

ইউরোপে বাংলাদেশের পোশাক রফতানি

রফতানি মূল্য মিলিয়ন ডলার

অর্থবছর ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ ২০২৫-২৬

	ওভেন			নিট			সর্বমোট			প্রবৃদ্ধি (%)
ইইউ দেশ	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৫-২৬
অস্ট্রিয়া	১২.৩৯	২১.০৭	২৫.৫৪	৩০.৫৮	৪৫.৬০	৪৭.৭৩	৪২.৯৭	৬৬.৬৭	৭৩.২৭	৯.৯০
বেলজিয়াম	১৭৬.৪৫	২১৪.৫৪	২২২.১৬	৩৪২.৩৪	৩৩৪.৮২	৩০৩.৯৬	৫১৮.৭৯	৫৪৯.৩৬	৫২৬.১২	-৪.২৩
বুলগেরিয়া	০.৪৭	১.১৫	১.৬২	১.১০	০.৫৫	১.০৭	১.৫৭	১.৭০	২.৬৯	৫৮.২০
ডেনমার্ক	৩৬২.৬২	৩৬৫.৫৩	৩৪১.৯৪	৬১৬.৯৭	৬৭৯.০৮	৫৯৮.৪২	৯৭৯.৫৯	১০৪৪.৬১	৯৪০.৩৫	-৯.৯৮
ফিনল্যান্ড	৮.৪৪	৯.০৪	৯.৯১	২১.১১	২৪.১০	২২.৯৪	২৯.৫৫	৩৩.১৪	৩২.৮৫	-০.৮৯
ফ্রান্স	৮০২.৯০	৮৩৪.৮৭	৭৯১.৭২	১২২৪.২৯	১৩২১.৮৯	১১৭৬.৬৩	২০২৭.১৯	২১৫৬.৭৬	১৯৬৮.৩৫	-৮.৭৪
জার্মানি	১৭৬১.০৮	১৮৮৬.৫৬	১৭০৪.৮২	২৭৬১.৫০	৩০৬৪.৩৪	২৬৭৬.৫৫	৪৫২২.৫৮	৪৯৫০.৯০	৪৩৮১.৩৭	-১১.৫০
গ্রিস	১৪.৬৭	১৪.৮১	১৪.৪০	৩৪.২৬	৪২.১৪	৩৯.৮২	৪৮.৯৪	৫৬.৯৫	৫৪.২২	-৪.৭৯
ইতালি	৫৬১.৮১	৫৮০.১৯	৫৩৬.২২	৯০০.৭৯	৯৫৯.৬৬	৮৮৩.৭৮	১৪৬২.৬০	১৫৩৯.৮৫	১৪২০.০১	-৭.৭৮
আয়ারল্যান্ড	৯১.২৪	৯০.১৬	৮০.৬৪	১৫৬.৮৪	১৬৩.৬০	১৪৭.৪৪	২৪৮.০৮	২৫৩.৭৬	২২৮.০১	-১০.১২
নেদারল্যান্ডস	৭৯৭.০৯	৮৬৯.১১	৯৪২.৭৩	৯২৬.০৬	১২১৯.৪৮	১২২৭.৫৪	১৭২৩.১৫	২০৮৮.৫৯	২১৭০.২৭	৩.৯১
পর্তুগাল	৩৬.৩৮	৩৬.০৯	৩৯.৩৯	৬৬.১৬	৭০.২১	৬৫.২৭	১০২.৫৩	১০৬.৩০	১০৪.৬৬	-১.৫৪
রোমানিয়া	৩৮.৬৭	৭২.৫০	৪৫.২২	৯৩.৪৬	১৫৫.৮৪	১৩৭.০০	১৩২.১৩	২২৮.৩৪	১৮২.২২	-২০.২০
স্পেন	১৫১৮.৬৮	১৪৪৯.৬৩	১৫৬০.৬১	১৮৫৫.৯৯	১৯৪৮.৪০	২০৪১.১৭	৩৩৭৪.৬৮	৩৩৯৮.০৩	৩৬০১.৭৮	৬.০০
সুইডেন	২৪৫.২৮	২৯৪.৩৮	২৯৩.৭৪	৪১৭.৭৫	৪৭৭.৪৬	৪৭৮.৫১	৬৬৩.০৩	৭৭১.৮৮	৭৭২.২৫	০.০৫
সাইপ্রাস	০.৩০	০.৬৯	০.৩০	২.২৭	২.১৪	২.৯৩	২.৫৭	২.৮৩	৩.২২	১৩.৮২
চেক প্রজাতন্ত্র	১২৫.১৬	১৪৬.২৬	১৪৪.৭৩	১৪১.১৩	১৭৭.৫৬	১৬৯.৪৫	২৬৬.২৯	৩২৩.৮২	৩১৪.১৮	-২.৯৮
এস্তোনিয়া	০.০৫	০.০৬	০.৩৩	০.৭৭	০.৬৩	০.৫৫	০.৮২	০.৭০	০.৮৮	২৫.৬২
হাঙ্গেরি	৪৩.৭০	৪১.০৭	৩৬.৭৭	১৩২.২৫	১৩১.৬৪	১৪৮.৫৪	১৭৫.৯৫	১৭২.৭১	১৮৫.৩১	৭.৩০
লাটভিয়া	০.১৭	০.১৭	০.৬৯	১.৬৭	১.১০	২.০৭	১.৮৩	১.২৭	২.৭৬	১১৭.৩
লিথুয়ানিয়া	০.০৯	০.১৭	০.৩৪	০.০৪	০.০৮	০.০৬	০.১৩	০.২৫	০.৪০	৬১.০৬
মাল্টা	০.৩২	০.৫২	০.৫৪	০.১২	০.৯৩	০.৪৭	০.৪৪	১.৪৪	১.০০	-৩০.৬০
পোল্যান্ড	৫৭৯.১৯	৬৭১.৪০	৭২০.৭৮	৯৬৯.৩৭	১০২৮.৪৯	১১৪৫.৬৭	১৫৪৮.৫৬	১৬৯৯.৯০	১৮৬৬.৪৫	৯.৮০
স্লোভাকিয়া	২১.১৯	২৩.৪৮	১৯.২৭	৪৭.৯০	৬০.৫৫	৫২.৬৫	৬৯.০৮	৮৪.০২	৭১.৯২	-১৪.৪১
স্লোভেনিয়া	১৭.৬৫	২৮.১৩	৩৪.৭৮	৪৫.৩৬	৮৪.৪০	১০৬.৮৯	৬৩.০০	১১২.৫৩	১৪১.৬৭	২৫.৯০
ক্রোয়েশিয়া	২২.৮২	২৬.৭৫	২.৭১	৩৩.৪৪	৩৪.৯৭	৭.৬৯	৫৬.২৬	৬১.৭২	১০.৪০	-৮৩.১৬
লুক্সেমবার্গ	২.২৭	১.০৬	০.৬২	৩.২৯	৩.০০	২.৭৪	৫.৫৬	৪.০৬	৩.৩৬	-১৭.২৩
সাব-টোটাল (ইইউ)	৭২৪১.০৫	৭৬৭৯.৩৬	৭৫৭২.৫১	১০৮২৬.৮	১২০৩২.৭	১১৪৮৭.৭	১৮০৬৭.৯	১৯৭১২.০	১৯০৬০.০	-
বিশ্বের মোট রফতানিতে ইইউ (%)	৪২.৯২	৪২.২২	৪১.৮৯	৫৬.১৫	৫৬.৮৭	৫৫.৭০	৪৯.৯৮	৫০.১০	৪৯.২৫	-
শতকরা প্রবৃদ্ধি	-০.৪৫	৬.০৫	-১.৩৯	-৭.৭৯	১১.১৪	-৪.৫৩	-৪.৯৮	৯.১০	-৩.৩১	-
যুক্তরাজ্য	১৬৮৭.৩৬	১৬৯১.২৭	১৬৮৮.৭৫	২৫০৭.২৩	২৬৫৭.৭৭	২৬৯৯.৩৫	৪১৯৪.৫৯	৪৩৪৯.০৪	৪৩৮৮.৫৫	০.৯১
যুক্তরাজ্যের (%)	১০.০০	৯.৩০	৯.৩৪	১৩.০০	১২.৫৬	১৩.০৯	১১.৬০	১১.০৫	১১.৩৪	-
শতকরা প্রবৃদ্ধি	-০.২১	০.২৩	-০.১৫	১.৭৭	৬.০০	১.৫৮	০.৯৬	৩.৬৮	০.৯১	-
সর্বমোট	১৬৮৬৯.২	১৮১৮৭.৯	১৮০৭৭.৩	১৯২৮২.২	২১১৫৯.১	২০৬২৩.৮	৩৬১৫১.৩	৩৯৩৪৭.০	৩৮৭০১.২	-১.৬৪
শতকরা প্রবৃদ্ধি	-৫.৩২	৭.৮২	-০.৬১	-৫.১৩	৯.৭৩	-২.৫৩	-৫.২২	৮.৮৪	-১.৬৪	-

রপ্তানি ব্যুরো ও এমইএ কর্তৃক কলিত

বণিক বার্তা
24 AUG 2026

ইউরোপ থেকে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পোশাক রফতানির উত্থান

মোহাম্মদ হাতেম
সভাপতি, বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের যাত্রা বা উত্থানে আমাদের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সরাসরি অবদান রয়েছে। অবদানটা কীভাবে? বাংলাদেশের আধুনিক গার্মেন্টস শিল্পের যে উত্থান, এটা মূলত ৭৯-৮০ সালের দিকের ঘটনা।

তখন আমাদের গার্মেন্ট শিল্পের অন্যতম একজন উদ্যোক্তা দেশ গার্মেন্টসের নুরুল কাদের সাহেব, যিনি '৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং স্বাধীনতার পর একজন সরকারের সচিব ছিলেন। '৭৪ বা '৭৫ সালে তিনি চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। তিনি বিভিন্ন রকম কাজকর্ম করতেন। আমরা যতটুকু মনে পড়ে বা জানি যে, তিনি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে একসঙ্গে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। সেই সূত্রে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। তিনি বিমানবন্দর উন্নয়নে যুক্ত হন। বিমানবন্দর নির্মাণে তার মালিকানাধীন কনস্ট্রাকশন ফার্ম সম্পৃক্ত ছিল।

ওই সময় একটা পর্যায়ে কোরিয়ার দাইয়ু কোম্পানি বাংলাদেশে আসে। তখন কোরিয়ার রফতানিতে নানা রকমের ডিউটি ও কোটা ইম্পোজ হচ্ছিল। তখন তারা সিদ্ধান্ত নিল বাংলাদেশে গার্মেন্টস সেক্টরকে ডেভেলপ করে এখানকার মাধ্যমে তারা রফতানি করবে, তাহলে সেই ডিউটি এবং কোটা তাদের লাগবে না। এ সূত্র ধরেই বাংলাদেশে তারা আসে।

বাংলাদেশে যখন আসে, তখন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নুরুল কাদের সাহেবকে বললেন যে, এ রকম একটা সুযোগ আছে, আপনি জয়েন্ট ভেঞ্চারে এখানে গার্মেন্টস তৈরি করেন। তখন যেই কথা সেই কাজ। জিয়াউর রহমানই দাইয়ুর সঙ্গে নুরুল কাদের সাহেবের পরিচয় করিয়ে দেন। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে দাইয়ু চট্টগ্রামের কালুরঘাটে দেশ গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠা করে।

সেই কারখানার ১৩০ জনকে কোরিয়াতে দাইয়ু কোম্পানি তাদের কারখানায় প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশে পাঠায়। এটা ১৯৮০ সালের দিকের ঘটনা। ১৩০ জনকে দাইয়ু কোম্পানি কোরিয়াতে তাদের ফ্যাক্টরিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশে পাঠায় এবং সেখানে যৌথ উদ্যোগে কারখানা চালু হয় এবং এখানে গার্মেন্টস উৎপাদন শুরু করে।

পরবর্তী সময়ে এই ১৩০ জনের প্রত্যেকে বাংলাদেশে গার্মেন্টসের পুরোধা হয়েছেন, ভিন্ন গার্মেন্টস শিল্প গড়ে তুলেছেন। তাদের মধ্যে থেকেই অবনী নিটওয়্যার থেকে শুরু করে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে আমাদের মরহুম মেয়র আনিসুল হকসহ আরো অনেকে আছেন, যারা সেই দেশ গার্মেন্টস থেকে কর্মজীবন শুরু করেন। এই হলো গার্মেন্টসের প্রাথমিক যাত্রার শুরু।

যখন যাত্রা শুরু হলো তখন আমাদের তো কিছুই নেই, সবই তো বিদেশ থেকে আনতে হতো। বিদেশ থেকে আনবে কীভাবে? তখন এটা নিয়ে নুরুল কাদের সাহেব বসলেন কাস্টমসের সঙ্গে। যেহেতু উনি একজন সরকারের আমলা ছিলেন, তিনি কাস্টমসের সঙ্গে কথা বলে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে বিদেশ থেকে আমাদেরকে এভাবে এই জিনিস ডিউটি ফ্রি এনে দিতে হবে। আনলে আমরা আবার এটাকে গার্মেন্টস বানিয়ে বিদেশে রফতানি করব। তাতে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হবে।

এরপর দেশ গার্মেন্টসের ফ্যাক্টরির পাশেই বন্ডেড ওয়্যারহাউজ হিসেবে একটি গোডাউন ভাড়া নিল। ভাড়া নিয়ে ওটার মধ্যে বিদেশ থেকে আমদানি করা কাপড়-চোপড় ও অ্যাকসেসরিজ রাখা হতো। বন্দর থেকে খালাস করে কাস্টমসের কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে ওই গোডাউনে রাখা হতো। প্রতিদিন সকালে কাস্টমসের কর্মকর্তা সেখানে এসে ওই দিনের উৎপাদন কার্যক্রমের জন্য গোডাউন খুলে কাপড় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক অ্যাকসেসরিজ বের করে দিত। দিনশেষে আবার ওটা তালা দিয়ে কাস্টমস কর্মকর্তা চলে যেতেন। এভাবে শুরু হয় এবং চলতে থাকল।

পরবর্তী সময়ে ওই ফ্যাক্টরির ভেতরেই বন্ডেড ওয়্যারহাউজের প্রচলন ঘটে, যা পরিবর্তন হতে হতে বর্তমানে বিশেষ বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সিস্টেমে পরিণত হয়েছে, যার ফলে বাংলাদেশে গার্মেন্টস সেক্টর বিশাল প্রসার লাভ করে।

কাঁচামাল গুদামজাতের ব্যবস্থা হলো। কিন্তু আনার অর্থাৎ আমদানির টাকা বা ডলার তো নেই। তখন তিনি আবারো সরকারের কাছে গেলেন। প্রথম যখন বিদেশে এলসি করবে এলসির ডলার পাবে কোথায়? তখন টিসিবির সঙ্গে আলোচনা করে টিসিবি থেকে কিছু ডলার নিয়ে উনি এলসি করলেন। কিন্তু এভাবে আর কত টিসিবির ডলার দেবে?

তখন তিনি একটা পন্থা উদ্ভাবন করলেন। তৎকালীন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নুরুল ইসলামের সঙ্গে তিনি বসলেন। ইসলাম সাহেবও নুরুল কাদের সাহেবের সহকর্মী ছিলেন। নুরুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে বসে এ পদ্ধতি চালু করেন যে ব্যাংকের কাছে এলসিটা (মাস্টার এলসি) মর্টগেজ রেখে ওইটার ৭৫ শতাংশ ব্যাক টু ব্যাক করা হবে। কোনো ধরনের টাকা-পয়সা ছাড়া ব্যাক টু ব্যাক করে বিদেশ থেকে কাঁচামাল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি আনবেন।

এনে রফতানি করলে পরে ওই ১০০ ডলারের রফতানি থেকে ৭৫ ডলার ব্যাংক পুরোটাই রাখবে এবং বিদেশে যেখান থেকে মাল আনা হয়েছে সেখানে ব্যাংক পেমেন্ট করে দেবে। আর বাকি ২৫ ডলার ব্যাংকের কাছে শতকরা ২৫ ডলার হিসেবে রিজার্ভে ঢুকে যাবে এবং সেটার বিপরীতে তাকে স্থানীয় খরচ মেটানোর জন্য টাকা দিয়ে দেয়া হবে। এভাবেই ব্যাক টু ব্যাক এলসির প্রচলন ঘটল এবং কোনো ধরনের টাকা-পয়সা ছাড়াই এই ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিশাল সুযোগ পেয়ে গার্মেন্টস সেক্টরের প্রসার খুব দ্রুত লাভ করল।

এই দাইয়ু কোম্পানি তখন ইউরোপের মার্কেটে তৈরি পোশাক রফতানি শুরু করল। ইউরোপ মার্কেট, তারপর আমেরিকার মার্কেটে রফতানি শুরু হলো ওই দাইয়ু কোম্পানির মাধ্যমে। এভাবে দেশ গার্মেন্টসের পর পরই আরো কিছু প্রতিষ্ঠান তখন গার্মেন্টস শুরু করল। রিয়াজ গার্মেন্টস আগেই ছিল, তারা ভারতে এবং অন্যান্য জায়গায় কিছু রফতানি করত মাঝে মাঝে। কিন্তু ইউরোপে মূলত শুরু হয় তখন।

এরপর আশির দশকের মাঝামাঝির পরে '৮৭-'৮৮ সালে নিট পোশাকের কিছু এক্সপোর্ট শুরু হলো। নিট পোশাক রফতানির শুরুটাও ইন্টারেস্টিং। এখানে যারা কাস্টমার, তারা আসত নারায়ণগঞ্জে। নারায়ণগঞ্জে হলো হোসিয়ারি শিল্প। ওখানে একজন ইন্ডিয়ান অরিজিন ব্রিটিশ এসেছিলেন বাংলাদেশে বেড়াতে। কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ একদিন আমাদের এখানে এলআর গ্রুপের মুফতি ভাই, তার সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক। তো সে বলতেছিল যে তোমরা তো এ রকম টি-শার্ট বানাতে সক্ষম। তোমরা হোসিয়ারি টি-শার্ট

এরপর » পৃষ্ঠা ১৬

বানিয়ে এখান থেকে রফতানি করতে পারো। তখন ওরা একটা স্যাম্পল বা নমুনা দিয়ে বলল এ রকম স্যাম্পল বানিয়ে আমাদের পাঠাও। তখন মুফতি ভাই স্যাম্পল বানিয়ে পাঠাল। পাঠানোর পর এটা অ্যাকসেপ্ট হলো। অ্যাকসেপ্ট হওয়ার পর হঠাৎ নারায়ণগঞ্জে এক এজিএম সাহেব একটা কাগজ নিয়ে এল। আপনার নামে তো একটা এলসি এসেছে, ইউকে থেকে। তখন তার মনে পড়ল স্যাম্পল দেয়া হয়েছিল। এভাবে তখন একটা অর্ডার এল।

তখন একটা রুমের মধ্যে চারটা ওভারলক মেশিন, একটা চেইন মেশিন, একটা লক মেশিন, এই চার-পাঁচটা মেশিন দিয়া এ অর্ডারটা। নরমাটিক থেকে সুতা কিনল, বাজার থেকে সুতা কিনে কাপড় নিটিং করল। নিটিং করে বেঙ্গল ডায়িং করল। এর পর গার্মেন্টস বা তখন রফতানি শুরু হয় নারায়ণগঞ্জ থেকে।

নিট পোশাকের বাজার বরাবরই ইউরোপেরটা বেটার ছিল। আমাদের মোট নিট পোশাক রফতানি ৫০ থেকে ৬০ শতাংশই যায় ইউরোপে। বাজারটি এরই মধ্যে অনেক বিকশিত হয়েছে। রফতানি আরো বাড়াতে হলে আমাদের দুটো কাজ করতে হবে। প্রথম কাজ হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের এফটিএ করা, যেটা ইন্ডিয়া ও ভিয়েতনাম করে ফেলেছে। এটা আমাদের খুব দ্রুত এগোনো দরকার।

নাম্বার দুই হলো আমাদেরকে পণ্যে বৈচিত্র্যকরণ। ম্যানমেড ফাইবারের, মানে হাই ভ্যালুড আইটেমে যাওয়া প্রয়োজন। কারণ ইউরোপে এখন এগুলোর ডিমান্ড অনেক বেশি। নরমাল বেসিক টি-শার্টের চেয়ে এ হাই ভ্যালুর প্রডাক্ট আমাদের দিতে হবে। না দিতে পারলে আমাদের পণ্য পিছিয়ে যাবে।

ইউরোপের মার্কেটটাকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের দুটোই মেইন। একটা হচ্ছে এফটিএ করা, আরেকটা হচ্ছে যে ম্যানমেড ফাইবার এবং ডাইভার্সিফায়েড প্রডাক্ট, ফ্যাশনেবল প্রডাক্ট এগুলোতে আমাদের যাওয়া এবং বাংলাদেশে যত দ্রুত সম্ভব ডিজাইন হাউজ তৈরি করা।

আগে কোনো কমপ্লায়েন্সের ইস্যু ছিল না, আস্তে আস্তে এগুলো কমপ্লায়েন্সের বিষয় এল। বর্তমানে সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ গার্মেন্টস সেক্টর কমপ্লায়েন্স এবং গ্রিন ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে অন্যতম শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছে।

বাংলাদেশের এ আধুনিক গার্মেন্টস ব্যবস্থা প্রচলনে এবং এর বিকাশে মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং নুরুল কাদের সাহেবের

The Financial Express
24 AUG 2026

Invest Bangladesh authority born

FE REPORT

BIDA, BEZA, PPPA MERGE INTO SINGLE BODY

Investors to have single point of access to investment opportunities, govt services like approvals, registrations, import-export facilities, incentives, industrial locations

Single platform also opens scope for unused govt land, facilities, shares, rights to be put to 'productive use'

Staff members of merged agencies to be absorbed into Invest Bangladesh

An integrated new apex investment-promotion agency styled 'Invest Bangladesh' sets sail with the heterogeneous regulators losing existence as the new government aspires to draw both local and foreign investments in simpler processes.

Bangladesh Investment Development Authority (BIDA), Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) and Public-Private Partnership Authority (PPPA) are merged to form the new authority.

The government published Sunday a gazette notification on the formation of Invest Bangladesh under the Invest Bangladesh Act 2026.

The authority also rolled out its new brand identity on its first working day, marking the beginning of a unified national investment platform.

Ashik Chowdhury, chairman of Invest Bangladesh, said the merger was aimed at organising government services more effectively around investors rather than merely combining institutions.

"By uniting our capabilities, we aim to provide clearer accountability and more coordinated support across the investment journey," he said at the launch of the authority.

The move is intended to address longstanding concerns among domestic and foreign investors about having to deal with multiple agencies for investment approvals, industrial locations, licences, incentives and infrastructure-related projects.

Under the new framework, investors will have a single point of access to investment opportunities and government services, including approvals, registrations, import-export facilities, incentives and industrial locations.

The Invest Bangladesh Act 2026 provides for an integrated framew[ork] covering economic zones, free-tra[de] zones and other declared industrial areas. It also establishes scope for unused government land, facilities, shares and rights to be put to productive use.

The law further provides clearer approval arrangements for PPP projects, including simplified procedures for smaller projects, whi[le] investment and business services a[re] to be brought onto a single digital platform.

Invest Bangladesh will continue operating BanglaBiz, the country's single digital platform for investme[nt] services, through which investors ca[n] obtain business licences and permit[s] online within specified timelines.

The authority is also working to

I SEE PAGE 7 COL

I FROM PAGE 8 COL 6

implement the 14-day business-licensing framework as part of the government's "wider effort to create a faster and more predictable business environment".

The agency states that the 180-day period set for implementing government's investment-related commitments made in March is nearing its end. It will publish a progress report on implementation before the deadline expires.

The creation of Invest Bangladesh represents the latest stage in Bangladesh's long-running attempt to streamline its investment-promotion institutions.

For decades, investment-related responsibilities were distributed among specialised agencies. The former Board of Investment was the principal institution for promoting and facilitating private investment before it was merged with the Privatisation Commission to create BIDA in 2016. BIDA was established as the country's apex investment-promotion agency under the BIDA Act, with responsibilities including investment facilitation, private industrial -project registration and policy advocacy.

Economic-zone development was subsequently handled separately by BEZA, established under the Bangladesh Economic Zones Act 2010, with the objective of developing and managing economic zones and facilitating investment within them. Its one-stop-service system was designed to provide regulatory services to economic zone investors and developers.

The PPP framework evolved along a different track. A PPP policy introduced in 2010 led to the establishment of the PPP Office in 2011, which became operational in 2012. The Public-Private Partnership Act 2015 subsequently provided the legal basis for transforming the PPP Office into an autonomous PPP Authority under the Prime Minister's Office.

As a result, Bangladesh had several investment-promotion institutions with different mandates. BIDA handled investment promotion and facilitation mainly outside specialised zones, while BEZA focused on economic zones and PPPA on infrastructure projects involving public-private partnerships. BIDA itself previously acknowledged the existence of multiple specialised investment-promotion agencies, including BEZA, BEPZA, PPPA, Bangladesh High-Tech Park Authority and BSCIC.

Invest Bangladesh is now intended to bring three of those major investment institutions under one roof.

The authority says economic zones would remain a priority because they provide investors with more efficient access to utilities and transport networks. At the same time, it will facilitate projects outside economic zones, including projects involving unused state assets, depending on the nature of the investment.

Existing investor services will continue after the mergers, with the institutional integration intended to create a single front office and more coordinated support throughout the investment lifecycle.

The mergers will not result in a break in service for existing employees. Regular officersand employees of BIDA, BEZA and PPPA will be absorbed into Invest Bangladesh in equivalent positions, with continuity of service and existing benefits protected.

Consultants, outsourced personnel and daily-wage workers will continue under their existing contracts or orders.

bdsmile@gmail.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Business Standard
24 AUG 2026

Invest Bangladesh Authority formally begins journey

INVESTMENT - BANGLADESH

TBS REPORT

Ashik Chowdhury appointed chairman for one year

The Invest Bangladesh Authority, formed by merging the Bangladesh Investment Development Authority (Bida), Bangladesh Economic Zones Authority (Bepza), and Public-Private Partnership Authority (PPPA), formally began operations by unveiling a new logo yesterday, its first working day.

Operating under the Prime Minister's Office, the authority will serve as the country's apex investment promotion agency.

The new authority aims to provide investors with a single, coordinated platform for approvals, registrations, import-export services, incentives, industrial zones and other government services.

The Invest Bangladesh Act, 2026, which came into force through a gazette notification on 20 August, provides the legal framework for the merger. It also sets out provisions for defining procedures and timelines for licences, approvals and government services.

The government expects the unified structure to make it easier to attract domestic and foreign investment by providing a one-stop service and reducing fragmentation among investment-related agencies.

Chowdhury Ashik Mahmud Bin Harun, popularly known as Ashik Chowdhury, has been appointed chairman of the Invest Bangladesh Authority for one year on a contractual basis. He previously served as executive chairman of Bida, and Beza and chief executive officer of PPPA.

Nahian Rahman Rochi and Air Vice Marshal (Retd) Md Shaharul Huda have SEE PAGE 4 COL 5

CONTINUED FROM PAGE 3

also been appointed members for the same period. Both previously served as executive members of Bida.

The government also promoted Md A Razzaque Sarker, director general of the Government Employees Hospital, to the secretary rank and appointed him as a member of the authority.

The appointments were announced through separate gazette notifications issued by the Ministry of Public Administration on 21 August.

"This is more than an institutional merger. It is about organising the government more effectively around the investor," Ashik Chowdhury said. "By uniting our capabilities, we aim to provide clearer accountability and more coordinated support across the investment journey."

Rochi told TBS that the initiative came from investors' demand for a single point of access to government services.

"Our objective will be to make the Invest Bangladesh Authority that single point of access, providing investors with a more coordinated, seamless and accountable experience throughout their investment journey," he said.

The authority will also continue operating BanglaBiz, the country's single digital platform for investment services, offering online and time-bound access to business licences and permits.

A visit to the authority's office in the capital found officials from Bida and Beza working from their existing rooms and desks yesterday. Former PPPA officials were also continuing to work from the agency's previous office in Agargaon.

Officials said there are plans to eventually bring employees of all three agencies under one roof. For now, however, they are carrying out their new responsibilities from their existing offices.

Regular officers and employees of the stakeholders will be absorbed into the Invest Bangladesh Authority in equivalent positions, with continuity of service and existing benefits protected.

Consultants, outsourced personnel and daily-wage workers will continue under their existing contracts or orders.

ঢাকা।

The Daily Star
24 AUG 2026

Invest Bangladesh starts journey

WHAT CHANGED?

- BIDA, BEZA and PPPA under Invest Bangladesh
- Investment services unified under one window
- Administrative integration to be gradual

STAR BUSINESS REPORT

Invest Bangladesh, the country's new apex investment promotion agency, began operations yesterday, bringing the Bangladesh Investment Development Authority (BIDA), Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) and Public-Private Partnership Authority (PPPA) under one umbrella.

Operating under the Prime Minister's Office, the new agency was formed following the publication of the gazette notification under the Invest Bangladesh Act, 2026. The Act came into effect on August 20.

The three agencies will continue to function as before, with existing investor services continuing under the new authority.

Their physical integration is expected to take place gradually, although their functions have already been brought under Invest Bangladesh.

The merger is intended to create a single front office and provide more coordinated support throughout the investment lifecycle.

Invest Bangladesh combines investment facilitation, policy coordination, economic zone development and public-private partnership functions, according to a statement from the agency.

The Act provides an integrated framework for economic zones, free-trade zones and other declared industrial areas, while setting out procedures and timelines for licences, approvals and government services.

A SINGLE WINDOW FOR INVESTORS

"This is more than an institutional merger. It is about organising the government more effectively around the investor," said Ashik Chowdhury, chairman of Invest Bangladesh.

"By uniting our capabilities, we aim to provide clearer accountability and more coordinated support across the investment journey. We will continue to respect our heritage while forging new chapters as a bigger and stronger team."

The move aims to give domestic and foreign investors a single point of access READ MORE ON B2

ঢাকা।